প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

লীলা মজুমদারের আত্মজীবনী : ‘পাকদণ্ডী’

বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের দ্বিতীয় আত্মজীবনী গ্রন্থ *‘পাকদণ্ডী’*। যদিও তাঁর *‘আর কোনখানে’* আত্মজীবনী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল এর আগে ১৯৬৭ সালে। সেখানে নিজের শৈশব জীবন থেকে বিবাহ পূর্ববর্তী জীবন পর্বের কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তিনি। *‘আর কোনোখানে’* আত্মজীবনীটি প্রকাশের ১০ বছর পর তিনি *‘পাকদণ্ডী’* লিখতে বসেন। ১৯৭৮ সালে *‘অমৃত’* পত্রিকায় *‘পাকদণ্ডী’* সর্বপ্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। পরে ১৯৮২-৮৩ সালের মধ্যে এর অবশিষ্টাংশ *‘মহানগর’* পত্রিকায় প্রকাশ পায়। ‘পাকদণ্ডী’ সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৮৬ সালে আনন্দ পাবলিকেশন থেকে। *‘আর কোনোখানে’* আত্মজীবনীটিতে জীবনের একটা খণ্ডিত পর্বই স্থান পেয়েছে। যদিও *‘পাকদণ্ডী’*তে লেখিকা খণ্ডিত জীবন পর্বকে পরিবেশন না করে নিজের শৈশব জীবন পর্ব থেকে বিবাহ পূর্ববর্তী জীবন পর্বের কথা তো লিখলেনই তার সঙ্গে বিবাহ পরবর্তী জীবন থেকে নিজের ৭৪-৭৫ বৎসর বয়স কাল পর্যন্ত জীবন পর্বের কথা জুরে ছিলেন। *‘পাকদণ্ডী’* আমাদের কাছে বিশ শতকের এক বৃহত্তর কাল পর্বে লেখিকার জীবনের ক্রমিক চিত্র তুলে ধরে। বুঝে নেওয়া যায় লেখিকার মানস বিবর্তনের নানা পর্যায়। পাশাপাশি বিশ শতকের সমাজ পরিবেশনের নানা চালচিত্রের সঙ্গেও পরিচয় ঘটায় বইটি।

‘আর কোনোখানে’ আত্মজীবনীটির মতই নিজের শৈশব জীবন পর্বের কথা দিয়েই *‘পাকদণ্ডী’*-র সূচনা হয়েছে। জীবনের এই পর্বটির আনুপুঙ্খিক বর্ণনা দিয়েছেন লেখিকা। তাঁর জন্ম কোলকাতা শহরে বড় জ্যাঠা উপেন্দ্র কিশোর রায়ের

বাড়িতে হলেও তাঁর জীবনের প্রথম এগারো বৎসরের একটা বড় অংশ কাটে পার্বত্য শহর শিলং-এ। পিতা প্রমদা রঞ্জন রায় ছিলেন ভারতীয় জরিপ বিভাগের কর্মী। সম্ভবত ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত তিনি শিলং-এ কর্মরত ছিলেন। পরিবারের বাকি সদস্যের বেশির ভাগ কোলকাতা শহরে বসবাস করলেও লীলার পিতা প্রমদা রঞ্জন ও মাতা সুরমা সন্তানদের নিয়ে শিলংএ সংসার পেতে ছিলেন।

শিলং এর অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে লীলার এক মুক্ত শৈশবের ছবি ফুটে ওঠে '*পাকদণ্ডী*'তে। কখনো নাসপাতি গাছ থেকে নাসপাতি পাড়তে তাকে দেখা যায়, কখনো বুনো আপেল পুড়িয়ে খেতে, কখনো বা হাস পেরুর সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধ করতে। শৈশব জীবনের এই আত্মমুগ্ধতার চিত্রগুলি তিনি বিশেষ দক্ষতায় অনেকটা ছোটদের গল্প বলার ঢঙেই বলে গেছেন প্রকৃতিকে তিনি কেবল উপভোগই করেননি প্রকৃতি যেন তার কাছে শিক্ষার পাঠশালা হয়ে উঠেছে। লীলা লিখেছেন–

"আরেকদিন এক নির্জন জায়গায় পাহাড়ের গায়ে একটা গর্ত দেখেছিলাম সবুজ একটা সাপ, নীল দুটি চোখ খুলে, চুপ করে পড়ে আছে। আমাদের চাকর পুন্ন বলেছিল, 'ও ঘুমোচ্ছে। সারা শীত ওরা ঘুমোয়।' আমরা অবাক! ঘুমোচ্ছে তো চোখ খোলা কেন? পন্নু বলেছিল। ওদের চোখের ঢাকনি থাকে না, তাই চোখ বন্ধ করতে পারে না। শীত কাটলে জেগে উঠবে, ঐ খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। ওটা পড়ে থাকবে, সাপের নতুন নরম খোলস হবে।''[১]

আরেক জায়গায় আছে–

"একদিন স্কুলে আমাদের টিচার বললেন বাইরে থেকে যার যা ইচ্ছা, ফুল, ফল, ফলপাতা এনে আঁকো।'' আমি পাথরের খাঁজ থেকে একটা সিলভার ফার্ণের গাছ উপরে, আশ্চর্য হয়ে দেখলাম প্রত্যেকটা সুতোর মতো মিহি শিকরের আগায় একটা ছোট্ট টুপি পরালো। টিচার বললেন, "যাতে জলের খোঁজে পাথরের মধ্যে

নেমে ওর ব্যথা না লাগে, তাই ভগবান ওর আগায় টুপি পরিয়ে দিয়েছে।"[২] এই ভাবেই প্রকৃতির সান্নিধ্যে লেখিকাকে জীব বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞানের পাঠ নিতে আমরা দেখি। সেই কারণেই হয়তো তিনি লিখেছেন–

"ঐ যে আমার ছোট বেলাটি কেটে ছিল পাহাড়ের বুকে, ছোট্টনদীর কলধ্বনিতে, ঝরনার ঝর ঝর শব্দে, বর্ষার প্রচণ্ড বরিষনে, গ্রীষ্মের মিষ্টিরোদে, শীতের বরফ জমা স্পর্শে, দিনরাত অবিরাম সরল গাছের শোঁ শোঁ শব্দের মধ্যিখানে, জন্তু-জানোয়ার, পাখি-প্রজাপতি, পোকা-মাকর পরিবেষ্টিত হয়ে, তারা আমার মনের পটে যে দাগ রেখে গেছিল, কোন মানুষের প্রভাবের চাইতে সে কম নয়।"[৩]

লীলা মজুমদারের সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টিতেই তো প্রকৃতির এক বিশেষ স্থান আছে। শৈশব জীবনে প্রকৃতির সান্নিধ্য লাভই তার যেন ভিত হয়ে উঠেছিল। নিজের জীবন উপলব্ধির পাঠ থেকে আত্মজীবনীকার লীলা মজুমদার পাঠকের কাছেও আবেদন রাখেন– *"সব ছোটদের শৈশব কাটা উচিত শহরের বাইরে প্রকৃতির কাছাকাছি। তা সে যেখানেই হোক।"*[৪]

লীলা মজুমদারের শৈশব জীবনে উন্মক্ততার পেছনে বাবা-মার এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। মাকে তিনি পেয়েছিলেন বিশেষ স্নেহময়ী ভূমিকাতেই। বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের মেয়ে সরলাদেবী যেখানে শৈশবে মা স্বর্ণকুমারী দেবীর স্নেহ বর্জিত রূপে দিন কাটিয়েছিলেন, লীলার ক্ষেত্রে তা হয়নি। *'আর কোনোখানে'* আত্মজীবনীটিতে মায়ের স্নেহময়ী রূপে কথাই তিনি সবচেয়ে বেশি লিখেছেন। *'পাকদণ্ডী'*তে চেরাপুঞ্জি যাবার স্মৃতিতে লিখেছেন–

"মা লম্বা কাঠের বারন্দায় আমাদের পথ চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অমনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আমাদের কোলে করে নামালেন। মায়ের মত আছে কি!"[৫]

লীলার শৈশব স্মৃতিতে ছেলে মেয়েদের রঙ্গ রোমাঞ্চ উপভোগ করাতেও

লীলার মা সুরমাকে দেখা যায়। কোলকাতাতে বেড়াতে গেলে তিনি ছেলে মেয়েদের বায়োস্কোপ দেখান– *“মা বললেন, বায়োস্কোপ দেখবি? সে আর বলতে! এ বায়োস্কোপ একজন একজন করে দেখতে হয়। মা লোকটাকে দুটো পয়সা দিলেন, একটা গোল মতন কাঁচের ভিতর দিয়ে আমি আগে দেখলাম।”*[৬]

লীলা শৈশব স্মৃতিতে পিতা প্রমদারঞ্জনের কঠোর স্বভাবের উল্লেখ করেন। *“একবার কলতলা থেকে বাবার এঁটোপাতের কুলের বিচি চুষেছিলাম বলে এইসা চড় মেরে ছিলেন যে এখনো মনে করলেই কান ঝিমঝিম করে।”*[৭] আবার বলেন– *“আরেকটা দিকও ছিল তাঁর। মনে আছে চেরাপুঞ্জিতে আমাদের হাতি চাপিয়েছিলেন। হাওদা-টাওদা ছিলনা, বোধ হয় হাতির পিঠে কম্বল টম্বল জাতীয় কিছু পাতা ছিল, লবড়-ঝবড় করছিল। দিলেন তুলে আমাদের চারজনকে।”*[৮] বাবার যে দিকটি ছোটবেলায় উপভোগ করতেন তা হল তার গল্পকাররূপ– *“এমনিতে ভয়ে আমাদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেত, কিন্তু যেই না সন্ধ্যেবেলায় আমাদের স্কুলের পড়া তৈরি হয়ে যেত, বালিশে ঠেস দিয়ে বসা বাবা অন্য মানুষ হয়ে যেতেন। তখন আমরা তাঁর কোলে পিঠে, পেটের ওপর চেপে বলে, গল্প শুনতাম। সব সত্যি গল্প। দেশে বাবাদের ছোটবেলার গল্প, জরিপ- বিভাগে কাজ করতে গিয়ে ঘোর বেঘো জঙ্গলে বাবার নানান লোমহর্ষণ অভিজ্ঞতার গল্প, কত হাসির, কত কান্নার গল্প।”*[৯]

লীলা মজুমদার ‘*পাকদণ্ডী*’তে তাঁর শিক্ষা জীবনের সূচনার দিনগুলির কথা তুলে ধরেছেন। শিলং-এ থাকা কালীনই লীলার শিক্ষা জীবনের সূচনা হয়। শিলং শহরে লরেটো কনভেন্ট স্কুলে তিনি ভর্তি হন। নিজের প্রথম স্কুল ভর্তির স্মৃতিতে তিনি লিখেছেন– *“পাহাড়ের মাথায় স্কুল, সেইখানে দিদিকে আমাকে নিয়ে গিয়ে মা ভর্তি করে দিয়ে এলেন।”*[১০] একজন মায়ের নিজের মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে যাওয়ার এই চিত্র কিন্তু সমকালীন যুগের প্রেক্ষিতে বেশ আধুনিক। প্রথম বাঙালি আত্মজীবনীকার রাসসুন্দরী দেবী (১৮০৯-১৯০০) বাড়িতে

পাঠশালা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার সুযোগ পাননি। পরবর্তীতে বিবাহের পর রাসসুন্দরী পড়াশুনা শিখেছিলেন লুকিয়ে সমাজের ভয়েই। কেবল রাসসুন্দরী দেবী নয় কৈলাশবাসীনী দেবী (১৮২৯-১৮৯৫) ও তাঁর আত্মকথা *'জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী'*-তে মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণে সমাজের বাধাকে চিহ্নিত করেছেন। উনিশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মেয়েদের শিক্ষার সূচনা হয় বিদ্যাসাগর, রামমোহন-দের মত সমাজ সংস্কারক, কল্যানকামী পুরুষদের উদ্যোগে। আর যে সমস্ত মেয়ে এর জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তাদের পেছনে ছিল বাড়ির আধুনিক মনষ্ক পুরুষ সদস্যদের সহযোগিতা। বিশ শতকের গোড়াতে লীলার মাতা সুরমার মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে যাওয়ার এই চিত্রে সমাজে মেয়েদের ভূমিকার নতুন রূপই প্রত্যক্ষ হল। প্রকৃত পক্ষে সুরমাদেবী নিজেও ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত। তিনি বিদ্যাসাগর কলেজে বি.এ. পড়েছিলেন। নিজের শিক্ষার কারণেই হয়তো তিনি ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্যোমি হতে পেরে ছিলেন। আর সমকালে এরকম অনেক বাঙালি মেয়ে ছিলেন যারা ঘরের গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে এসে প্রচলিত সামাজিক রীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। সুরমাদেবী সেই গণ্ডি ভাঙা মেয়েদেরই প্রতিনিধি।

শিলং এ লরেটো কনভেন্ট স্কুল জীবনের অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়ে তিনি তুলে ধরেছেন দেশীয় ছাত্রদের বর্ণবৈষম্যের শিকার হওয়ার কথা। সেই সময় লরেট কনভেন্ট স্কুল ছিল খ্রিষ্টিয় মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশী বিদেশী উভয়ই ছিল। লীলা লিখেছেন– *"মেয়েগুলোর মধ্যে কেউ কেউ আমাদের নেটিভ্, নিগার বলত, ব্লাকি বলত। টিচারদের মধ্যেও কেউ কেউ নিগার না বললেও, ভারি অসম্মানজনক ব্যবহার করতেন।'' রাগে আমার গা জ্বলে যেত। মা কে জিজ্ঞাসা করলে বললেন, "নেটিভ তো খারাপ কথা নয়। নেটিভ মানে এই দেশে যাদের জন্মষ'' মানেটা ভালো হতে পারে কিন্তু ঘৃণাটা চিনতে একটুও দেরি লাগতনা।''*[১১]

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয়দের অবজ্ঞার চোখে দেখা বা বৈষম্যমূলক

আচরণের নানা ইতিহাস আমাদের জানা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গান্ধীজি এই সকল বিখ্যাতজনেরাও তাঁদের নিজের জীবনে ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর দ্বারা বর্ণবৈষম্য বা অবজ্ঞাসূচক আচরণের শিকার হয়েছিলেন। শিলং-এ লরেটো কনভেন্ট স্কুলে লেখিকার বর্ণবৈষম্যের শিকার হওয়া পূর্বতন ইতিহাসকেই মান্যতা দেয়।

শৈশব জীবনের নানা স্মৃতির মধ্যে লীলা মজুমদার উল্লেখ করেন সমকালীন সময়ে জ্যাঠামশাই উপেন্দ্র কিশোরের ছোটদের বই ছাপার উদ্যোগের কথা।

"তখন একেবারে মুখ্য ছিলাম, বইয়ের ধার ধারতাম না। ঠিক সেই সময়ই যে কলকাতায় আমাদর মেজ জ্যেঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর আর তাঁর বন্ধু যোগীন্দ্রনাথ সরকার ছোটদের জন্য কেমন বই লেখা হবে, কোথায় ছাপা হবে, কেমন ধারা ছবি হবে, কি করে তার ব্লক তৈরি হবে, এইসব প্রশ্ন নিয়ে ভেবে আকুল হচ্ছিলেন, সেকথা আমি ঘুনাক্ষরেও টের পাইনি। ইতিমধ্যে জ্যাঠামশাইয়ের বেশ কতকগুলো বই বেরিয়েও গেছিল, হাফ-টোন ব্লকে নিজের ছাপাখানায় তার জন্য চমৎকার সব নিজের হাতে আঁক রঙীন ছবিও ছাপা হচ্ছিল, তাও জানতাম না।"[১২] এই ভাবেই সমাজ ইতিহাসের একেকটা পর্ব স্থান পেয়েছে *'পাকদণ্ডী'*তে। আর ছোটবেলায় কোলকাতায় গিয়ে *'সন্দেশ'* পত্রিকার প্রথম প্রকাশের সাক্ষ্য হওয়ার ঘটনাও রয়েছে *'পকদণ্ডী'*তে। লেখিকার কথায়—

"ফিরে যাবার আগে আরেকটি ঘটনা ঘটে ছিল, আমাদের ওপর যার প্রভাব ছিল সুদীর্ঘ ও সুদূর প্রসারী। সে হল উপেন্দ্রকিশোরের 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশ। ১লা বৈশাখ ১৩২০। সেদিনটি আমার এখনও মনে আছে। সন্ধ্যেবেলা আমরা সকালে দোতলার বসবাস ঘরে বসে আছি। ... এমন সময় জ্যাঠামশাই হাসতে হাসতে ওপরে উঠে এলেন। হাতে তাঁর 'সন্দেশের প্রথম সংখ্যা। কি চমৎকার তার মলাট। গালভরা সন্দেশ, হাতে 'সন্দেশ' ভাই-বোন শোভা পাচ্ছে।"[১৩] এই স্মৃতিগুলি কেবল পারিবারিক সদস্যদের গুণকীর্তন নয় এর সঙ্গে জুড়ে রয়েছে

বাংলার ইতিহাস। এই সন্দেশ পত্রিকা লেখিকার জীবনে যে গভীর প্রভাব পেলে ছিল তার কথাও তিনি বলেন--

"ওই যে জ্যাঠামশাই 'সন্দেশ' ঢুকিয়ে দিলেন আমাদের জীবনে, আমার মনে হয় কালে কালে ও-ই আমাকে যতখানি প্রভাবিত করেছিল, তেমন আর কিছু নয়। এমন কি জ্যাঠামশাই নিজেও না। ১৯১৩ সালের এই ঘটনার পর তিনি মাত্র দু'বছর বেঁচেছিলেন, কিন্তু আমার সমস্ত শৈশব চিন্তার কেন্দ্র ছিল ওই একটি ছোট মাসিক পত্রিকা, তার কবিতা গল্প ছবি ধাঁধাঁ, কোনও মানুষনা। জ্যাঠামশাই পরলোকে যাবার পরেও সে প্রভাব এতটুকু স্তিমিত হয়নি। কবে যে নিজে পড়ে বাংলা ভাষার রস গ্রহণ করতে শিখেছিলাম সে আর মনে নেই। কিন্তু সে যে 'সন্দেশ' এবং জ্যাঠামশায়ের ইউ রায় অ্যান্ড সন্সের প্রকাশিত নানান্ অবিস্মরণীয় বইয়ের জন্যই সম্ভব হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।"[১৪] জীবনের প্রতিটা উপলব্ধি বা মানসিক বিকাশের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো আত্মজীবনীকারের কাজ। লীলা মজুমদার সেই কাজটাই করে গেছেন *'পাকদণ্ডী'*র মধ্য দিয়ে।

লীলা শৈশবের যে সময়টাতে শিলং-এ কাটিয়ে ছিলেন তখন বিশ্ব আকাশে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের দামামা বেজে উঠিছিল। *'পাকদণ্ডী'র* পাতায় তার কিছু কিছু প্রসঙ্গ আমরা পাই। লীলা মজুমদার লিখেছেন– *"বাড়িতে মা মাসির মুখে মাঝে মাঝে শুনতাম ইউরোপে যুদ্ধ হচ্ছে। আমাদের নতুন আয়া ইলবন প্রায়ই বলত, "আমার ভাই ফ্রাং-এ গেছে লড়াই করতে, আমার ছেলে হেড্রিক্সনের বাপ ফ্রাং এ গেছে, এখন আর তার কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছেনা।" ...আজকাল আমাদের সেলাই ক্লাসে উল্‌বোনা শেখানো হত। শুনলাম সোল্‌জারদের জন্য গলা-বন্ধ বোনা হবে, ফ্রান্সে লড়াই হচ্ছে। সেখানে বড্ড শীত।*

আরো শুনলাম মেমরা, অর্থাৎ আমাদের ফিরিঙ্গী সহপাঠিনীরা বুনবে সোল্‌জারদের জন্য, স্কুল থেকে তাদের ফাঁকি উল্ দেওয়া হল। মাদার হায়াসিন্থ নিজে ফরাসী মেয়ে, তিনি আমাদের সেলাই শেখাতেন, এমন চমৎকার

সেলাইয়ের হাত কম দেখেছি। তিনি বলতেন, "তোমরা ইন্ডিয়ান সোল্‌জারদের জন্য বুনবে। বাড়ি থেকে উল্‌ কিনে নিয়ে এসো।" বাবা তখন ট্যুরে, যামিনীদা উল কিনে এনে দিল। সে আমাদের রান্নার লোক হলেও, বাবা-মার পরেই তার প্রাধান্য ছিল। আমাদের দেশের গ্রামেই বাড়ি, হয়তো ঠাকুমা ওকে দিয়েছিলেন। অন্তত: হাবভাব দেখে তাই মনে হত। যামিনীদাকে খাঁকি উলের নমুনা দেওয়া সত্ত্বেও, গাঢ় লাল উল এনে দিল। এবং বদলে আনতে অস্বীকার করল। ভয়ে ভয়ে মাদার হায়াসিন্থকে উল দেখালাম। তিনি বললেন, "ঠিক আছে। সব রঙই সমান গরম।" তাই বোনা হল সাদা কালো মেমের মেয়েরা বুনল সাহেবদের জন্য খাঁকি গলাবন্ধ আর আমরা বুনলাম আমাদের দেশ ভাইদের জন্য লাল, নীল, হলদে, সবুজ যার যেমন ইচ্ছে, কিম্বা যামিনীদাদের যেমন ইচ্ছে।"[১৫] বড় সরল সাবলীল গদ্যে লীলা মজুমদার শৈশব জীবনের এই প্রসঙ্গকে তুলে ধরছেন কিন্তু এর মধ্যে এক বৃহৎত্তর সমাজ ইতিহাস ধরা পড়েছে। ইতিহাসের পাতায় আমরা পড়েছিলাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তৎকালীন ব্রিটিশ ঔপনিবেশ ভারতবর্ষ মিত্রশক্তির রসদ ও সৈনিকের যোগানদারে পরিণত হয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছিল ইউরোপস্থিত যুদ্ধক্ষেত্রে। তাদের কেউ কেউ ছিল শিলং-এর খাসিয়া মেয়ে ইলবনের ভাই বা তাঁর স্বামীর মত সাধারণ ভারতীয়। আর ভারতীয়রা এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেও তাঁরা যে সাহেব সৈনিকদের সমমর্যাদা পাননি তা স্পষ্ট হয় স্কুলের দ্বারা আলাদাভাবে *'সাহেব সোলজার'*দের জন্য *'গলা-বন্ধ'* তৈরীর জন্য ফাঁকি উল এর ব্যবস্থা থেকে। আর সেই খাঁকি উল বুনবে ভারতীয় ছাত্রেরা নয় *'ফিরিঙ্গী'* সহপাঠিনীরা'। সব জায়গাতেই বৈষম্য। তবে সেদিন হয়তো লীলার মত সাধারণ ভারতীয়দের হাতে মিত্রশক্তির পক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিতে যাওয়া ভারতীয় সৈনিকেরা *'লাল, নীল, হলদে, সবুজ'* বিবিধ রঙের উলে বোনা গলা বন্ধ পেয়েছিলেন। এই ইতিহাসেই আমাদের সান্ত্বনা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমকালিন সময়ে যে বিভৎসতার সৃষ্টি হয়েছিল তার শিকার হওয়া এক মেয়ে সেদিন শিলং-এ আশ্রয় নিয়ে ছিলেন, লীলা মজুমদার গভীর সমবেদনা সেই মানুষটির কথা আমাদের কাছে বলে যান– ''শুধু যুদ্ধটা দূরেই থেকে গেল। দূরেই থেকে গেল, যতদিন না মিস্ লেভেন্স এসে আমাদের সেলাইয়ের ক্লাস নিতে আরম্ভ করলেন। এই মানুষটিকে কিছুতেই ভুলতে পারি না। বয়স হয়তো বছর কুড়ি, অদ্ভূত ফ্যাকাশে রঙ, ফিকে সোনালী চুল, তাতে এতটুকু জেল্লানেই পালকের মতো পাতলা শরীর চোখ দেখে মনে হত সর্বদা জলে ভরে আছে। ক্লাসের বেকুফ্ মেয়েগুলো বলল্, *'বেল্‌জিয়াম থেকে এসেছে। জার্মানরা ওর চোখের সামনে ওর বাপ ভাইদের মেরে ফেলেছে, বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিছু নেই ওর। রেড্‌ক্রসের লোকেরা ওকে পাঠিয়েছে। ওর কাপড় চোপড়গুলো পর্যন্ত অন্য লোকে দয়া করে কিনে দিয়েছে।''* [১৬]

এইভাবে সমকালীন সময়ের চালচিত্রের ছবি তুলে ধরার কারণে লীলা মজুমদারের আত্মজীবনী এক বিশেষ মানবিক দলিলে পরিণত হয়েছে। তিনি সময়ের অভিঘাতে জীবনের নানা প্রসঙ্গের কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে ওযুধপত্রের যোগানের অভাবে ১৯১৫ সালে উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর কথা।

"১৯১৫ সালে জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর একটা কারণ শুনেছিলাম যে যুদ্ধের জন্য বিলেত থেকে ওযুধপত্র আসা বন্ধ হয়েছিল।'' [১৭] আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সমকালীন সামাজিক সংকটের পরিচয় পেয়ে যাই। লীলা মজুমদার লিখেছেন এই সময় তাঁর পিতা প্রমদারঞ্জন রায়ও যুদ্ধে যাবার জন্য উদ্যোগি হয়েছিলেন *"এর মধ্যে এক সময় বাবা বলে বসলেন, 'যুদ্ধে যাব'।''* [১৮] শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁর যাওয়া হয়নি। *"প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন বাবা। আফিসের ছোট সাহেবরা দু'জন চলেও গেল। তবু বাবাকে নিলনা। বাবার রাগ দেখে কে।''* [১৯]

প্রকৃতপক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে শিক্ষিত বাঙালী সমাজ তথা গোটা বিশ্বই

একটা সদর্থক ভূমিকাতে গ্রহণ করে ছিল। সকলেরই ধারনা ছিল যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্বে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির অবসান ঘটেবে কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শেষের বিশ বছরের মাথায় বিশ্ব আকাশে আবার দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের দামামা বেজেছিল।

লীলা মজুমদারের ছোটবেলায় শিলং বাসের নানা স্মৃতির মাঝে আছে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিলং আসার ঘটনা। সে সময় তিনি *'বাংলার বাঘ'* হিসাবে খ্যাত ছিলেন। লীলা মজুমদার শৈশব স্মৃতির এই প্রসঙ্গকে রোমাঞ্চকরভাবে উপস্থাপন করেছেন। শৈশবের অজ্ঞানতায় সেদিন তিনি *'সত্যিকার বাঘ'* দেখতেই গিয়েছিলেন তাদেরই বাড়ির পাশে *'নরেক্স'* নামে বাড়িতে। কিন্তু 'সত্যিকার বাঘ' দেখা তার হয়নি।

"নরেক্সের গেটের বাইরে থেকে দেখতে পেলাম বারান্দায় একটা জল চৌকিতে একজন ঝুলো গোঁফ ভয়ঙ্কর মোটা বুড়ো মতো মানুষ বসে আছেন, গায়ে একটা গেঞ্জি, সেটার পিঠের দিকটা তুলে একটা লোক দলাই-মলাই করে দিচ্ছে! ওই নাকি বাংলার বাঘ। আমার রাগ দেখে কে!''[২০] কিন্তু বাড়িতে এসে তার আসল পরিচয় পেয়ে ছিলেন। তিনি লিখেছেন–

"মা-মাসিকে সব কথা বলতেই উল্টো ফল হল। "বলিস কি রে? উনি যে দেবতুল্য মানুষ! চল, প্রণাম করে আসি।'' আশু মুখুজ্জেকে ঐ একবার কাছে থেকে দেখেছিলাম। অন্য দিন মা আমাদের নানান ইংরিজি বই থেকে গল্প বলতেন, সতুও বসে শুনত। সেদিন আশু মুখুজ্জের তেজের গল্প বললেন। কেমন রেড রোড বলে কলকাতায় একটা রাস্তা আছে, আগে সেখানে দিয়ে কোন ভারতীয়কে যেতে দিত না। আশু মুখুজ্জে তখন হাইকোর্টের জজ, তিনি নিয়ম অমান্য করে তবু গেলেন। ব্রিটিশ সার্জেন্ট জজ সাহেবকে চিনতে না পেরে, তাঁর নামে মামলা করতে গিয়ে কি হয়রাণ হয়েছিল, সে গল্পও শুনলাম। সেইসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মসম্মান সম্বন্ধে নানা রকম গল্প শুনে আমরা তাজ্জব বনে গেলাম।

আমরা যে পরাধীন কথাটার মানেই ভালো বুঝতাম না। এর আগেই দেশের জন্য কতজন প্রাণ দিয়েছিল, দ্বীপান্তরে গিয়েছিল, সব বললেন মা সেদিন। ক্ষুদিরামদের উল্লাসকর দত্তদের বাড়ির সঙ্গে বোধ হয় জ্যাঠামশাইদের যাওয়া আসা ছিল। মার চোখে জল দেখেছিলাম।'' [২১]

এই যে মায়ের মুখে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তেজের গল্প, বিদ্যাসাগরের আত্মসম্মানের গল্প, ক্ষুদিরাম, উল্লাসকর দত্তের দেশের জন্য আত্মদানের গল্প শুনে ছোট্ট লীলার পরাধীনতা সম্পর্কে সেদিন যে জ্ঞান হয়েছিল তা কেবল লীলারই নয় আপামর বাঙালি সমকালীন সময়ে দেশের পরাধীনতা সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেছিলেন। 'পাকদণ্ডী'তে লীলার শৈশব জীবনের এই স্মৃতি পরাধীন ভারতের জাতীয়তাবোধ জাগরণের পর্যায়কে তুলে ধরেছে।

জীবনের অলিন্দের নানা খবরা-খবর দিতে দিতে লেখিকা জানিয়েছেন ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পর্কে তার অজ্ঞতার কথা। অকপটে স্বীকার করেছেন ছোটবেলায় মায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথের *'খেয়া'* বইটি পেয়েও ছিড়ে ফেলে ছিলেন *'আচার'* রাখবার জন্য পরিস্কার কাগজের দরকারে।

"নতুন ঘর হল, ঘর বইয়ের তাক হল। মায়ের বাক্স থেকে অনেকগুলি বই বেরুল, সেগুলি ওই তাকে সাজিয়ে রাখা হল। তার মধ্যে পাতলা মলাটের একটা সরু বই ছিল, তার নাম 'খেয়া'। ... মা ওই বইটা আমাকে দিয়ে বললেন, 'এটা তোমার।' পড়বার চেষ্টাও করেছিলাম, একবর্ণ মানে বুঝিনি। বই তাকে তোলা থাকল। পরে আচার রাখবার জন্য পরিষ্কার কাগজের দরকার হলে, ওর একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়েছিলাম। তাই নিয়ে আমাকে যথেষ্ট 'হেনস্থা' হতে হয়েছিল। আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম। তাও সব পাতাটা নিইনি, খানিকটা ছিঁড়ে ছিলাম মাত্র।'' [২২]

জীবন সত্যের এরূপ স্বীকারুক্তি 'পাকদণ্ডী'কে পাঠকের অনেক কাছাকাছি নিয়ে যায়। *'খেয়া'* বইটি ছিঁড়ে ফেলে লেখিকার হেনস্থা হওয়ার ঘটনা থেকে

বোঝা যায় রবীন্দ্র সাহিত্যকে বিশেষ শ্রদ্ধার পরিসরে দেখা হত এই পরিবারে। তবে কেবল তাঁদের পরিবারের নয় লেখিকা জানিয়েছেন সমকালীন সময়ে বাঙালি সমাজে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ অন্তরঙ্গতার কথা। *"তখন সবাই বলত রবিবাবু, কেউ তাঁর কথা বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ বলে উল্লেখ করত না। তিনি ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেলেও, সব বাঙালীর মধ্যে একজন ছিলেন। তাই তাঁকে বলা হত রবিবাবু, যেমন বলা হত বঙ্কিমবাবু, দ্বিজুবাবু। এ-সব ডাকের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গতা ছিল।''* [২৩]

রবীন্দ্র সম্পর্কে লীলার অজ্ঞতার অবসান ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথ যখন শিলং-এ এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন সে সময় শিলং-এর বাঙালীদের রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে উন্মাদনার কথা।

"সেই কবিতা গল্পের রবীন্দ্রনাথ শিলং-এ বেড়াতে এলেন। শহরসুদ্ধ সব বাঙালী তাঁকে দেখবার জন্য ভেঙে পড়ল।'' [২৪]

এই সকল তথ্য একটা জাতির সামাজিক ইতিহাসের দলিলে পরিণত হয়েছে। লেখিকা লিখেছেন সে সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলং-এ এসেছিলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতিমা দেবীও। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেখানে গান গেয়েছিলেন। তাঁর গান গাওয়া প্রসঙ্গে লেখিকা লিখেছেন– *"গান গেয়েছিলেন দিনেন্দ্রনাথ, বাজের মত গম্ গম্ করেছিল সুর গলার মধ্যে। এখন পুরনো রেকর্ডে সেই কণ্ঠ শুনলে কষ্ট হয়, কারণ তার কিছুই ধরা যায়নি। কোথায় সমুদ্রের নিনাদ আর কোথায় টিনের ভেঁপু।''* [২৫]

আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মনে রাখলেও রবীন্দ্র প্রতিভার বিচ্ছুরণে হারিয়ে যাওয়া দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত প্রতিভাধর মানুষদের কিন্তু ভুলে গেছি। লেখিকা তাঁদেরই আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন '*পাকদণ্ডী*'র পাতায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নিজের মুগ্ধতা প্রসঙ্গে লিখেছেন– *"রবীন্দ্রনাথ 'পুরাতন ভৃত্য' আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। বাংলা ভাষা যে কি আশ্চর্য জিনিস হঠাৎ*

বুঝতে পেরেছিলাম।'' [২৬] এই বাংলা ভাষাকে পরবর্তীকালে লেখিকাও নিয়ে যেতে পেরেছিলেন উচ্চতর মাত্রায়। তাঁর মানস বিবর্তনের একেকটি পর্বকে এভাবেই পেয়ে যাই পাকদণ্ডীর পাতায়।

লীলা মজুমদার তাঁর জীবন কথা লিখতে গিয়ে কাছে পাওয়া আরেকজন মানুষের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন, তিনি সুকুমার রায়। পাকদণ্ডীতে সুকুমারের শিলং আসা, তাকে ঘিরে সেখান কার বাঙালিদের উন্মাদনার কথা রয়েছে। লেখিকা লিখেছেন সুকুমারের 'ভাবুক সভা : 'চলচিত্ত-চঞ্চরি পাঠ শুনে শ্রোতারা কেরকম মহিত হয়েছিলেন।

"এক ধারে বড়দা দাঁড়িয়েছেন, হাতে একটা খাতা, সবার চোখে তাঁর ওপর। ... বড়দা হাসিমুখে চারদিকে একবার তাকিয়ে একটু গলা খাঁকরে ভাবুক-সভা পড়তে শুরু করলেন।... সে কি মুখ-ভঙ্গি, সে কি হাত পা নাড়া, কথার মধ্যিখানে এ কি রসের ধারা? কি একটা বাক্যাতীত ভাবে আকণ্ঠ ভরে গেছিল, হাসতে ভুলে গেছিলাম। পড়া শেষ হলে সকলে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে, এ-ওর দিকে তাকাতে লাগল। একটা মানুষের গলার এমন সমারোহ যে হতে পারে কেউ জানত না। সম্বিৎ ফিরে এলে সব খুশিতে ফেটে পড়ল।

তখন কি আর কেউ বড়দাকে ছাড়ে? 'চলচ্চিত্ত-চঞ্চরি' পড়তে হল। আবার সেই সম্মোহিত ভাব।'' [২৭]

আমরা সাহিত্যিক সুকুমার রায়কে ভুলতে বসেছি। '*পাকদণ্ডী*'র পাতায় তাঁর সাহিত্য প্রতিভার এই সকল স্বাক্ষর থেকে তাঁকে নতুন করে খুঁজে পাওয়া যায়। ছোট বেলায় সুকুমার কে কাছে পাওয়া লেখিকার জীবনেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। লেখিকা জানিয়েছেন, বড়দার কাছ থেকেই প্রথম হাসির পাঠ পেয়েছিলেন।

জীবনের এক একটা ঘাত প্রতিঘাতের কথা বলতে গিয়ে ছোটবেলায় মা-মাসিদের মুখে শোনা তাদের অনাথ জীবনের বেদনার কথাও শুনিয়েছেন

লেখিকা। লেখিকার মাতামহ রামকুমার ভট্টাচার্য (পরবর্তীতে সন্ন্যাস গ্রহণ করলে নাম হয় রামেন্দ্র ভারতী) বিবাহের পর ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করলে তাঁর শ্বশুর অচলানন্দ তাকে ত্যাগ করেছিলেন নিজের মেয়ে কেও যেতে দেননি স্বামীর কাছে। পরে রামকুমার তার স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়ি থেকে লুকয়ে নিয়ে এসেছিলেন। ২৬ বছর বয়সে তিন সন্তান রেখে স্ত্রীর মৃত্যু হলে রামকুমার সন্ন্যাস গ্রহণ করে ছিলেন। কিন্তু অনাথ সন্তানদের দায়িত্ব নিতে লীলার মায়ের মাতামহের পরিবার এগিয়ে আসেননি। লীলা লিখেছেন– *"অচলানন্দ তবু মেয়েকে ক্ষমা করেননি। দাদামশাই সন্ন্যাস নিলে, অনাথা মেয়ে তিনটিকে আনবার জন্য দিদিমার মা নাকি কেঁদে আকূল হতেন; তবু তাঁর মন গলেনি।"* [২৮]

এই সকল কাহিনী বাঙালির ধর্মীয় গোড়ামির এক একটা পর্বকে প্রকাশিত করে। লীলার মা সুরমা মানুষ হয়েছিলেন উপেন্দ্র কিশোরের কাছে, ছোট মাসি লতিকা মানুষ হয়েছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে আর তার বড় মাসি সুষমাকে হোস্টেলে যেতে হয়েছিল। এই মা মাসিদের অনাথ জীবনের বেদনা লীলাকে ছোটবেলাতেই গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। মায়ের কথা বলতে গিয়ে লেখেন– *"নিজের মায়ের কথা মার মনে পড়ত না, খালি মনে হত একটা বন্ধ দরজা ওপর থেকে শিকলি তোলা। তার বাইরে মা আর বড় মাসিমা দাঁড়িয়ে আর বড় মাসিমা মাকে বলছেন, ঐ ঘরে মা আছে। ওরা আমাদের মার কাছে যেতে দিচ্ছে না।"* লাফিয়ে লাফিয়ে কেবলি শিকলি খোলার চেষ্টা করে, কেঁদে মাকে বলছেন, *"ওরে তুই কাঁদছিল না কেন? তুই ছোট, তুই কাঁদছিস না কেন? তুই ছোট, তুই কাঁদলে ওরা নিশ্চয়ই দরজা খুলে দেবে। আমি যে বড় হয়ে গেছি।" বড় মাসিমার তখন পাঁচ বছর। এখন ভাবি ঐ মা-মাসির মেয়ে হয়ে সারা জীবন ছোটদের জন্য বই লেখা ছাড়া আমার উপায় কি ছিল?"* [২৯]

লীলা মজুমদারের ছোটদের লেখাপত্রে আমরা যে বড়দের চরিত্রগুলি পাই তাতে দেখি তারা অনেকবেশী হৃদয়হীন, লোভী, হিংসুটে। তাঁর পোদিপিসির

বর্মী বাক্স, টংলিং এই গল্প গুলিতে সেই চিত্র বার বার ফুটে ওঠে। তিনি অনেক বেশী যত্নে ছোটদের চরিত্র নির্মাণ করেছেন যারা বড়দের পৃথিবীর হিংসা-বিদ্বেষ-হৃদয়হীনতার মাঝে বেঁচে থাকে। *'টংলিং'* গল্পে যেমন চাঁদ বেঁচে থাকে বড়দের হিংসা বিদ্বেষের মাঝে নিজের কাল্পনিক *'পেরিস্থান'* তৈরী করে। মা-মাসিদের ছোটবেলাকার অনাথ জীবনের বেদনার পরিসর গুলি হয়তোবা শিশু সাহিত্যিক লীলাকে ছোটদের চরিত্র নির্মাণে প্রেরণা দেয়, বড়দের পৃথিবীর হৃদয় হীনতার মাঝে বেঁচে থাকার লড়াই করতে। *'পাকদণ্ডী'*র আরও বেশ কিছু জায়গা থেকে এভাবেই সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণার দিকটি আভাসিত হয়।

বিচ্ছিন্ন স্মৃতিতে লেখিকা নিজের ছোটবেলার কথা বলতে গিয়ে অনেক মানুষের কথাই স্মরণ করেছেন। লিখেছেন নীলমণিবাবুর কথা যার চেহারার সঙ্গে ছোটবেলায় তিনি বাইবেল স্টোরিজের গড্ এর মিল খুঁজে পেতেন। লেখিকা লিখেছেন, *"নীলমণিবাবু ছিলেন ব্রাহ্ম প্রচারক। চেরাপুঞ্জিতে ছিল তাঁর ডেরা। বহু দুঃখী পর্বতবাসী তাঁর বাড়িতে যেত, খাসিয়া ভাষায় লিখতে শিখত। নিরক্ষর গায়ের লোক সব, তখনো সভ্যতার আলো অতদূর পৌঁছায়নি, প্রকৃতিক শক্তির পুজো করত তারা। সাপের পুজো করত, আদিম সব বিশ্বাস ছিল। তাদের মধ্যে নীলমণিবাবু কাজ করতেন। যতদূর মনে হয় যার খুশি তাঁর বাড়িতে যেতে পারত। নিরামিষভোজী সাত্ত্বিক মানুষটি বিয়ে করেননি। এ সমস্তই পরে শোনা; এর জন্য তিনি আমার মনে দাগ কাটেননি। যেজন্য তাঁকে মনে আছে সে হল তাঁর বাড়িতে যারা আসছে, খাচ্ছে আমিও ডাঁটা চিবুতে পাচ্ছি আর তাঁর ঐ অবিস্মরণীয় ভজহরি কুকুরটি।''*[৩০] নীলমণিবাবুর মত মানুষেরা যে সমকালীন সময়েন শিলং পাহাড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ব্রাহ্ম ধর্মের বিস্তার ঘটিয়ে ছিলেন আমরা জানতে পারি। নীলমণিবাবুর উদার সেবাপরায়ণ রূপটি ছোটবেলায় লেখিকাকে স্পর্শ করেছিল। মানুষের জীবনে এভাবেই একেক জন মানুষ ছাপা ফেলে যায় হয়তো আমাদের অজান্তেই।

লীলা ছোটবেলায় আরেকজন উদার ব্যক্তিত্বশালী মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তিনি হলেন- সারদামঞ্জরী দত্ত ('মহাযাত্রার পথে' আত্মজীবনীর রচয়িতা)। এই মানুষটির কথা তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে লিখেছেন। সারদামঞ্জুরী দত্তকে ছোটবেলায় লেখিকা দিদিমা সম্বোধন করতেন– *"দিদিমাকে মা ডাকতেন 'মাসিমা', তাঁর নাম ছিল সারদামঞ্জরী দত্ত।"* ৩১ ছোটবেলায় লেখিকা এই দিমির স্নেহ ভালোবাসা পেয়েছিলেন। তার কথা লিখতে গিয়ে লিখেছেন–

"এখন ভাবি দিদিমা মানুষটিও অনন্য সাধারণ চিলেন। ৬০/৬৫ বছর আগেকার কথা, তখনি কতজন অবিভাবকহীন বাঙালী মেয়ে দেখেছিলাম যাঁরা পুরুষদের চাইতে কোন দিক দিয়ে কম ছিলন না। এঁদের অনেকেই ব্রাহ্ম সমাজের মেয়ে; তার একমাত্র কারণ হিন্দু-সমাজের তেজী মেয়েরাও সমর্থনের অভাবে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ পেতেন না। সারা জীবন তাঁদের কটুভাষী অনিচ্ছুক আত্মীয়-স্বজনদের কাছে হাত পেতে থাকতে হত, নয়তো কুলত্যাগিনী হতে হত। শিলং-এ সরোজিনী মাসিমা ছিলেন, তাঁর চেহারাটি ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারি না। তবে সোনার বো-বাঁধা পিন্ দিয়ে বুকে একটা ছোট্ট সোনার ঘড়ি ঝোলাতেন, তার দিক থেকে আমি চোখ ফেরাতে পারতাম না। এঁরা ছিলেন অবস্থাপন্ন ঘরের উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে। দিদিমার কথা আলাদা। .... দিদিমা ওখানকার মেয়েদের মিড্ল্ স্কুলে পড়াতেন। তাই দিয়েই বোধ হয় ওঁর সংসার চলত। কি করে এত পারতেন জানি না।... দিদিমার বড় মেয়ে সুবর্ণ মাসির সঙ্গে ডঃ সুন্দরী মোহন দাসের ছেলের বিয়ে হয়েছিল। মেজ মেয়ে লাবন্য মাসির সঙ্গে কর্ণেল মনীন্দ্র দাসের বিয়ে হয়েছিল। মেজ মেয়ে লাবণ্যমাসির সঙ্গে কর্ণেল মণীন্দ্র দাসের বিয়ে হয়েছিল। ভারি চমৎকার চেহারা ছিল তাঁর। মেজ মেয়ে আশামাসির সঙ্গে ডঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের বড় ছেলের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু দিদিমা ছিলেন অন্য জগতের মানুষ। একদিকে গোঁড়া ব্রাহ্ম আর অন্যদিকে সমুদ্রের মতো উদার। শিলং-এর ব্রাহ্মদের সেকালের জীবন নিয়ে সুন্দর একখানি বইও লিখেছিলেন।

বইটির নাম ভুলে গেছি, লেখিকার মতোই সরল, বলিষ্ঠ, অসঙ্কোত, সুন্দর লেখা। নিয়ে এসে আমাকে দিয়ে একখানা কিনিয়ে ছিলেন, সেই জন্য আমিই ঋণী। আমার কোনও বই তাঁকে কোনো দিনও দিয়েছি বলে মনে পড়ছে না।''[৩২]

৭০ উর্ধ্ব বয়সে এসে নিজের ছোটবেলাকার স্মৃতিতে সারদামঞ্জরী দত্তের কথা স্মরণ করতে গিয়ে লেখিকা আত্মশ্লাঘা বোধ করেছেন। তবে লেখিকা সারদামঞ্জরী দত্তের পরিচয় যে ভাবে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন তাতে দেখা যায় তিনি বাঙালি নারীদের সামাজিক অবরোধের ইতিহাসের দিকটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সারদামঞ্জরী দত্ত সরলাদেবীর সমসাময়িক, তার জন্ম ১৯৫৭ সালে। সমকালীন সময়ে সাধারণ ঘরের মেয়ে হয়েও জীবনে তিনি সাবলম্বী হয়ে ছিলেন, শিলং-এ শিক্ষকতার চাকুরি করে সংসার প্রতিপালন করেছিলেন, পাশাপাশি তাঁর উদার স্নেহপরায়ণ ব্যক্তিত্বকে লেখিকা শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করেছেন।

পূর্ব মাতৃকাদের এভাবে আত্মজীবনীতে তুলে ধরা থেকে লীলা মজুমদারের মননের পরিচয় পেয়ে যাই।

'পাকদণ্ডী'তে লেখিকা আমাদের জীবনের একেকটা ক্রমিক পর্বের সঙ্গেই পরিচয় ঘটিয়েছেন। ১৯১৯ সালে পিতার চাকুরির বদলির সূত্রে পরিবারের সঙ্গে তাকে আসতে হয় কলকাতা শহরে। শুরু হয় কোলকাতার শহুরে জীবন। কোলকাতায় এসে প্রথম কিছুদিন থাকতে হয়েছিল জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোরের ১০০নং গড়পারের বাড়িতে। পাকদণ্ডীতে এই বাড়ির চালচিত্রের মানুষজনের বিস্তৃত পরিচয় তিনি দিয়েছেন। কোলকাতায় এসে দেখেছিলেন তাঁর জ্যাঠাইমা উপেন্দ্র কিশোরের স্ত্রীর শোকার্ত জীর্ণরূপ।

"জ্যাঠাইমাকে চিনতে পারছিলাম না। থান-পরা পাকা চুল, দুঃখী-মুখ, ছোটখাটো এই মানুষটিই কি আমাদের সেই জ্যেঠিমা, যিনি আমার মাকে মানুষ করেছিলেন? চার বছর হল জ্যাঠামশাই চোখ বুজেছেন, এই সময়টুকুর মধ্যে জ্যাঠাইমা অন্য মানুষ হয়ে গেছিলেন। সংসার থেকে নিজেকে একেবারে সরিয়ে

নিয়েছিলেন। আর তিনি এ বাড়ির কর্ত্রী ছিলেন না। সংসারের দায়িত্ব দুই বৌয়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। নিজের মধ্যে গুটিয়ে এক্কেবারে এত্তটুকু হয়ে গেছিলেন।'' [৩৩]

ছোটবেলাকার স্মৃতিতে জ্যাঠাইমার জীবনের এই পরিণতির কথা স্মরণ করে লেখিকা তার বেদনার কথাই জানিয়েছেন– *"এখন ভাবলে দুঃখ হয় যে জ্যাঠাইমার বয়স তখন বড়জোর বাহান্ন-তিপ্পান্ন বছর। বুড়ো হবার বয়সই নয় সেটা। কিন্তু একটা মানুষের অভাবে তাঁর জীবনের কাজ ফুরিয়ে গেছিল।''* [৩৪]

বোঝা যায় মেয়েদের জীবনে স্বামী নির্ভরতার বাইরে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তাকেই তিনি গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। লেখিকা লিখেছেন কোলকাতায় এসেই কি রকম তাঁর ছোট জ্যাঠা কুলদারঞ্জন তাঁদের ছোট ভাই বোনদের 'বড়দিনের কোলকাতা' দেখিয়েছিলেন। সেই কোলকাতা দর্শনের রোমাঞ্চের কথা তিনি গোপন করেন নি। সমকালীন কোলকাতার নানা চালচিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। লীলা কোলকাতায় আসার পর ছোট জ্যাঠার উদ্যোগের আরেকটি পরিচয় দিয়েছেন, তা হল বাড়ির মেয়েদের ইডেন গার্ডেনে ক্রিকেট খেলা দেখাতে নিয়ে যাওয়া।

"ছোট জ্যাঠামশাই বোধ হয় সবটাকে বাড়াবাড়ি করতেন। একদিন ১৯২২ সালে, ভাগ্নী, ভাইঝিদের একটা দল নিয়ে ইডেন গার্ডেনে উপস্থিত হলেন। ক্যালকাটা ক্লাবের সায়েবদের সঙ্গে টাউন ক্লাবের খেলা। বড় জ্যাঠা মশাই উপস্থিত থাকবেন। বলাবাহুল্য এই পরিকল্পনার কথা তাঁকে আদৌ বলা হয়নি। ছেলেদের শিক্ষা সম্বন্ধে যতই উদার হন, নিজের মেয়েদের বাড়িতে পড়াশুনোর ব্যবস্থা করেছিলেন, স্কুলে দেন নি। ১৫-১৬ বছরের মধ্যে বিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই আমাদের খেলার মধ্যে যাওয়া সম্বন্ধে তাঁর সমর্থন থাকা অসম্ভব। না জানানোই ভাল।

এখানে বাবার মনোভাব অবধানযোগ্য কথাটা পাড়তেই তিনি ছোট জ্যাঠা মশাইকে বললেন, "দেখ ছোড়দা, তুমি যা খুশি করতে পার, খালি আমাকে এর

মধ্যে জড়িওনা। একপাল মেয়ে নিয়ে তুমি যেও। আমি বাধা দেবনা। কিন্তু আমি আলাদা যাব।''

তাই করা হল। ... ছোট জ্যাঠামশাই আমাদের মাঝখানে বসে ক্রিকেট খেলার নিয়ম-কানুন বলে দিতে লাগলেন। ... কিন্তু আমরা ৮-৯টি বোনই যে প্রথম বাঙালী মেয়ে ক্রিকেট ফ্যান এবং প্রথম দর্শক, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। সেদিনের স্মৃতিটি আমার মনের পটে সোনার জলে লেখা হয়ে রইল। আজ পর্যন্ত তার মাধুর্য এতটুকু টশ্‌কায় নি।'' [৩৫]

বাড়ির মেয়েদের ক্রিকেট খেলা দেখতে যাওয়ার এই ঘটনাকে লেখিকা বাঙালি মেয়েদের মধ্যে প্রথম হিসাবেই গণ্য করেছেন। লীলা ও তার বোনেদের মাঠে গিয়ে খেলা দেখার অভিজ্ঞতা বাঙালি মেয়েদের মধ্যে প্রথম কিনা এই বিচারে না গিয়েও বলা যায় সমাকালীন যুগের প্রেক্ষিতে এ ঘটনা নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী। এর পূর্বেই বাঙালি মেয়েরা স্কুল কলেজের শিক্ষার জন্য ঘরে বাইরে বেরিয়েছিল। ব্যাতিক্রমি কিছু বাঙালি নারী ঘরের বাইরে এসে সামাজিক নানা কাজের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিল। যেমন, সরলা দেবী মহিশুরে শিক্ষকতার কাজ করেছেন, *'পাকদণ্ডী'*তে পাই সারদামঞ্জরী দত্তের মত বাঙালী মেয়েরা শিলং এ শিক্ষকতার কাজ করে সংসার প্রতিপালন করতেন। তবে বাঙালি মেয়েদের ঘরের বাইরে বিচরনের আড়ষ্টাতার দিকটি বোঝা যায় সরলাদেবী যখন *'জীবনের ঝড়পাতায়'* লেখেন *'বীরাষ্টমী'* উৎসবের আয়োজন করেও পর্দার আড়ালেই তাকে অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে হয়েছিল।[৩৬] আর জনসমক্ষে সামাজিক অনুষ্ঠান দেখার ক্ষেত্রেও পর্দার একটা আড়াল থাকতই। ঠাকুর বাড়ির মেয়েদেরও পর্দার আড়ালেই বাড়িতে মঞ্চস্থ নাটক ইত্যাদি দেখতে হত। এরকম একটা যুগের প্রেক্ষাপটে লীলার ছোট জ্যাঠার বাড়ির মেয়েদের ইডেন গার্ডেনে খেলা দেখতে নিয়ে যাওয়া যুগান্তকারী ঘটনাই। আর সামাজিক অবরোধের শৃঙ্খলে আবদ্ধ মেয়েদের প্রতিনিধি হয়েই জীবনের এই স্মৃতিকে *'সোনার জলে'* লিখতে চেয়েছেন

'সেদিনের স্মৃতিটি আমার মনের পটে সোনার জলে লেখা হয়ে রইল। আজ পর্যন্ত তার মাধুর্য টশ্‌কায়নি।'

*'পাকদণ্ডী'*তে লীলা মজুমদার তাঁর ছোট জ্যাঠাকে জীবনে কাছে পাওয়ার আরও নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন সেই সঙ্গে তাঁর শিক্ষার প্রতি অনুরাগ,, সাহিত্য চর্চার কথাও বলেছেন। ছোটজ্যাঠার সাহিত্য চর্চার প্রসঙ্গে লিখেছেন– *"ছোটজ্যাঠা ছোটদের উপযুক্ত করে ইংরেজি থেকে নাম করা সব বই বাংলায় অনুবাদ করতেন। এত ভালো অনুবাদ খুব বেশি দেখিনি। আর কি সব বই, কোনান ভরলের শর্লক হোম্‌সের বিচিত্র কীর্তি কাহিনী, বক্সার ভিলের কুক্কুর; জুল ভের্ণের আশ্চর্য দ্বীপ ইত্যাদি যতসব রোমাঞ্চময় কাহিনী। তাঁর লেখা দেশী-বিদেশী পৌরাণিক গল্পের কথা তো আগেই বলেছি। ঝর ঝরে সহজ কিছু বিশুদ্ধ বাংলা, মূল গ্রন্থের সমস্ত রসটি রক্ষা করে, নদীর স্রোতের মতো বয়ে চলছে।"*[৩৭] এই ভাবেই এক একজন বাঙালি সাহিত্য কৃতিকে খুঁজে পাওয়া যায় *'পাকদণ্ডী'*তে।

লীলা কোলকাতায় এসে কাছে পেয়েছিলেন তাঁর বড়দা অর্থাৎ সুকুমার রায়কে। তিনি লিখেছেন– সুকুমারকে ঘিরে তাঁদের বাড়িতে তখন এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি হত। তাঁর বড়দার কাছে আসতেন কলিদাস নাগ, কালিদাস রায়, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, জীবনময় রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, এরমত ব্যক্তিত্বরা। বড়দা ও তার বন্ধু বর্গের *'মন্ডে ক্লাবের'* কথা তিনি লিখেছেন।[৩৮] এই সকল পরিচয় থেকে বাঙালির সংস্কৃতি চর্চার একটা যুগের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর বড়দার বন্ধুবর্গকে ঘিরে বাড়ির কমবয়েসি মেয়েদের আকর্ষণের কথাও লেখিকা লিখেছেন। তবে তাঁর মাত্রাটির পরিচয় ও দিয়েছেন– *"সেখানের ব্যাপার তো, একটু হাসি, দুটি কথা পর্যন্ত দৌড়, একসঙ্গে বেরুবার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারত না।"*[৩৯]

কোলকাতায় এসে আরো অনেক পারিবারিক সদস্যদের কাছে পাওয়ার

কথা লেখিকা জানিয়েছেন। বড়জ্যাঠা সারদারঞ্জন এর কথা বলতে গিয়ে তার খেলাধূলোর প্রতি ভালোবাসা, ভারতে ক্রিকেটের প্রসারে তার অবদানের দিকগুলি তুলে ধরেছেন। এইভাবেই পারিবারিক চালচিত্রের কথা বলতে বলতে লেখিকা নিজেরও বড় হয়ে ওঠার কথা বলে গেছেন। কোলকাতায় এসে তিনি ভর্তি হন কলকাতার ডায়েসেশন স্কুলে। প্রথমদিকে হোস্টেলে থেকেই পড়াশুনো করতে হয়েছিল, সেই হোস্টেলজীবনের বেদনার কথাও তিনি লিখেছেন। শিলং এর লরেটো কনভেন্ট স্কুলে বাংলা পড়ানো হোত না, ডায়োসেশাল স্কুলে এসে শুরু হয় বাংলা শেখার তোড়জোড়। প্রথমে বাংলা পড়ার জন্য স্কুলের শিক্ষকদের কাছে হেনস্থা হবার কথাও তিনি লিখেছেন। ডায়োসেশাল স্কুলের শিক্ষকদের, পড়ুয়া জীবনের আরও নানা কথাই তিনি লিখেছেন। ডায়োসেশান স্কুলে থাকতেই পরিচয় হয়েছিল রেবা রায়ের সঙ্গে। রেবা রায় সে সময় সঙ্গীত সম্মিলনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে নাচ করার জন্য কীভাবে সমালোচনা হয়েছিল তার কথা লীলা লিখেছেন।

"সঙ্গীত সম্মিলনীর বার্ষিক উৎসবে যতদূর মনে হয় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের হলে, রেভা রায় প্রকাশ্যে নেচেছেন। সাজসজ্জার কথা আর কি বলব? কণ্ঠার হাড়ের ওপরে, কনুইয়ের নিচে আর পায়ের কব্জির নিচে ছাড়া, শরীরের কোনো জায়গা দেখা যায়নি। তবু ভদ্রলোকের মেয়ে স্টেজে নাচল বলে শহরময় টি টি পড়েছিল।"[৪০] সমাজে নারীর অবদমনের ছবিগুলি বাদ দেন নি লীলা মজুমদার। অভিনেত্রী শোভা সেনও তার আত্মকথায় প্রকাশ্য মঞ্চে অভিনয় করবার জন্য সমকালীন সময়ে সমালোচিত হওয়ার কথা লিখেছেন।[৪১] *'জীবনের জল ছবি'*তে প্রতিভা বসু ও মঞ্চে অভিনয় করার জন্য সমালোচিত হওয়ার কথা জানিয়েছেন।[৪২] এই সকল ঘটনাগুলি বিশ শতকের কুড়ির-তিরিশের দশকে বাঙালি নারীর সামাজিক অবস্থানের পরিচয় আমাদের দিয়ে যায়।

লীলা মজুমদারের জীবনে লেখক হয়ে ওঠার এক অদম্য আগ্রহ ছিল তাই হয়তো আত্মজীবনীতে জীবনের ঘটনা বৃত্তের নানা পরিচয়ের মধ্যেও তাঁর লেখক

হয়ে ওঠার পর্বটিকে সযতনে তুলে ধরেছেন। শিলংএ থাকতেই ৮-৯ বছর থেকেই ভাই-বোনদের বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলার মধ্য দিয়ে সে প্রচেষ্টার শুরু হয়েছিল। কোলকাতায় এসে ডায়োসেশান স্কুলের মেয়েদের হাতে লেখা *'প্রসূণ'* পত্রিকায় সেই প্রচেষ্টা আরও গতিপ্রাপ্ত হয়। *'প্রসূণ'* পত্রিকায় লেখালেখির চর্চা বিষয়ে জানান- *"'প্রসূণ' বলে আমাদের ক্লাসের মেয়েরা একটা হাতে লেখা মাসিক পত্র বের করতে লাগল। সকলের কি উৎসাহ। একটি মাত্র কপি বেরোত, চমৎকার করে ছবি-টবি আঁকা হত। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, জীবনী সব থাকত। বলা বাহুল্য আমি তার সম্পাদিকা ছিলাম না। আমার সে যোগ্যতা ছিলনা, যদিও উচ্চাকাঙ্ক্ষা যথেষ্ট ছিল। কারণ তখনো আমি 'বাংলায় কাঁচা।' সকলে তাই বলত। বলত আমার গল্প নিঃসন্দেহে সব চাইতে সরস, আমার প্রবন্ধও খুব ভালো কবিতা লিখতাম না। কিন্তু আমি বাংলা জানিনা। এ নিন্দা আমি মেনে নিয়েছিলাম। প্রাণপণ চেষ্টা করে বানানটা অনেকখানি সরগড় করেছি। কিছু কিছু বানানের নিয়মও শিখেছি এক সারি অভিধানের স্মরণ নিয়েছি। তবু সে অর্থে সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বাংলা জানতেন, আমি এখনো জানি না। বাংলা জানি না। কিন্তু ইংরেজি জানি। তাতে আমার অনেক সাহায্য হয়। অদ্ভুত শোনালেও কথাটা সত্যি।"* [৪৩]

নিজের লেখিকা জীবনের বিকাশের পর্বগুলির সঙ্গে তিনি এভাবেই আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন। একদিকে যেমন *'প্রসূণ'* তাঁর গল্প, প্রবন্ধ লেখার চর্চা চলত সেই সঙ্গে বাড়িতে ও সমান্তরালভাবে ছোট বোন, ভাইকে কখনো গল্প বলে তাঁর সঙ্গে ছবি এঁকে লীলার লেখিকা হয়ে ওঠার পর্ব চলতে থাকে। তবে সব কিছুর মধ্যে সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি ঘটেছিল 'সন্দেশ' পত্রিকার জন্য বড়দা সুকুমারের গল্প চাওয়ার মধ্যে। লীলা লিখেছেন–

"এই সময় বড়দা হঠাৎ একদিন আমাকে বললেন, সন্দেশের জন্য একটা ছোট গল্প লিখেছে।" আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এমন সৌভাগ্যের কথা

আমি ভাবতে পারিনি। কিন্তু পারব তো? বড়দা বললেন, *"পারবিনে কেন? ভাই বোনদের তো ঝুড়ি ঝুড়ি গল্প বলিস। সেই রকম একটা দে।"* [৪৪]

১৯২৩ সালে মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে সাহিত্যকার সুকুমার রায়-এর অকাল মৃত্যু ঘটে। সুকুমার রায়ের অকাল মৃত্যু রায় পরিবারের জন্য বেদনাবহ ছিল কিন্তু তার থেকেও বড় ছিল বাঙালি এক প্রতিভাধর লেখক ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছিল। তবে লীলা মজুমদার পাকদণ্ডীতে নিজের কথা বলতে গিয়ে সুকুমার রায়ের ব্যক্তি জীবনের ও সাহিত্য সৃষ্টির নানা প্রসঙ্গের উল্লেখের মধ্য দিয়ে এই প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বকে নতুন করে খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। মৃত্যুর স্মৃতি স্মরণ করতে গিয়ে সুকুমার রায়ের সাহিত্য সৃষ্টির বিশিষ্টতার দিকগুলিকে তুলে ধরতে গিয়ে তিনি যেভাবে রবীন্দ্রনাথের ছোটদের লেখা, উপেন্দ্রকিশোরের লেখার সঙ্গে তুলনা করে বাংলা শিশুসাহিত্যে তাঁর অবদানের দিকটিকে দেখিয়েছেন তাতে লীলা মজুমদারের বাংলা শিশু সাহিত্য সম্পর্কে গভীর বোধ ও মমত্ত্বের দিকটিকে বোঝা যায়।[৪৫]

সুকুমার রায়ের মৃত্যুর অল্প কিছু দিন পরেই উপেন্দ্র কিশোরের স্থাপিত ইউ রায় এন্ড সন্স প্রকাশনা *'সন্দেশ'* পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছিল। এমনকি উপেন্দ্র কিশোরের ১০০ নং গড়পাড়ের বাড়িটিও নিলাম হয়। পারিবারিক জীবনের এই সকল বিপর্যয়ের দিনগুলির স্মৃতিকে তিনি স্মরণ করেছেন।

লীলা মজুমদারের ব্যক্তি জীবনে মায়ের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল তার কথা আত্মজীবনীতে বারবার এসেছে। নিজের কৈশোর জীবনের কথা বলতে গিয়ে এই সময় কিভাবে মায়ের কাছে যৌন শিক্ষার পাঠ পেয়েছিলেন তা জানিয়েছেন। লেখিকার কথায় – *"এদিকে ১৯২২ শেষ হল ১৯২৩ শুরু হল। আমার পনেরো বছর বয়স হল। নাবালকত্বর আর কিছু বাকি রইলনা। এর আগেই মা দিদিকে আমাকে ডেকে নিয়ে একদিন অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, "মানুষের ছেলে মেয়ে কেন হয় জানিস?" আমরা তো অবাক। আমতা আমতা করে বললাম,*

"ভগবান দেন।'' মা সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হাতে করে কিছু দেন না মানুষরা নিজেরা পাকায়।'' এই বলে সোজা বাংলায় আমাদের মুখের দিকে চেয়ে মানুষের জন্মরহস্য উদঘাটন করে দিলেন। আমি তখন হয়তো ১৩ পূর্ণ হয়ে ১৪য় পড়েছি। আমাদের ভিক্টোরীয় মায়ের মুখে এমন অকথ্য সংবাদ শুনে বলা বাহুল্য আমরা শক্‌ড্। একেভারে 'শকু'। জাপানী ভাষা উপযুক্ত শব্দ না থাকায়, ওরা শক্‌ড্‌কে বলে 'শকু'!

শকু হলেও একেবারে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়নি। অনেকগুলো জিজ্ঞাস্য বিষয়ে সেই সুযোগে জেনে নিলাম। ... "তাহলে তো বিয়ে না হলেও ছেলে হতে পারে।'' মা বললেন, "পারেই তো'। তার অসুবিধাগুলোও বুঝিয়ে দিলেন। মা সেই এক দিনই ঘন্টা খানেকের মধ্যে আমাদের একটা চলনসই যৌন বিজ্ঞানের পাঠ দিলেন। আর কোনও দিনও বিষয়টা উত্থাপন করেন নি। তবে কতকগুলো ভালো ইংরেজি বই কিনে দিয়েছিলেন। আমার ভিক্টোরীয় আদর্শে মানুষ মায়ের পক্ষে এই পাঠ দেওয়া যে কত শক্ত কাজ ছিল এবং তিনি যে কি স্পষ্ট ও নির্মলভাবে যে পাঠ দিয়েছিলেন ভেবে আশ্চর্য হই।''[৪৬]

লীলার মাতা সুরমা নিজে মাতৃহীন ছিলেন কিন্তু কৈশোরপ্রাপ্ত নিজের সন্তানকে তিনি জীবনের বাস্তব জ্ঞানগুলি দিয়েই বড় করতে চেয়েছেন। মায়ের দ্বারা এইরূপ যৌন বিজ্ঞানের পাঠ সন্তানদের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার দিকটিকে স্পষ্ট করে। ছেলে মেয়েদের পড়াশুনোর ক্ষেত্রে সুরমা ছিলেন খুবই উৎসাহী। তাই তো লিখেছেন– *"কোনো দিনই মুখে কিছু বলেন নি, তবে লেখা যদি ভালো হত, তবে ভারি খুশি হতেন।''* [৪৭]

জীবনের ঘটনা বৃত্তের কথা বলতে গিয়ে লীলা এক জায়গায় বলেছেন তাঁদের পারিবারিক পরিচিত বুলাদা লীলার দিদির জন্ম দিনে *'রবীন্দ্রনাথের গল্প গুচ্ছ'* উপহার দিলে লীলার বড় মাসিমা আপত্তি করেছিলেন, এমনকি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্প ছোটদের পড়া উচিত নয় বলেও মন্তব্য করে ছিলেন। কিন্তু সুরমা

মেয়েদের পড়াশুনোর ক্ষেত্রে স্বাধীন বিচারের দিকটিকেই প্রশ্রয় দিতেন। লেখিকার কথায়–

“মা একটু হেসে বললেন, “তেমন ছোট আর কোথায়, তেরো চৌদ্দ বয়স হল। ওরা তো সব পড়ে, শরৎবাবুর বইও।’’ মাসিমা প্রায় মুচ্ছো যান আর কি! শেষটা কিছু না বলে দিদির নতুন বইগুলির গোটা আষ্টেক গল্পের পাশে ছোট ছোট দাগ দিয়ে নোটনকে বললেন, “তুমি এগুলো পড়বে না।’’ নোটনের বাংলা বই পড়ার কোন আগ্রহই ছিল না, কিন্তু দিদি আর আমি সেই গল্পগুলোকে খুঁটিয়ে পড়েও আপত্তিকর কিছু আবিষ্কার করতে পারিনি। ... মনে পড়ল মা বলতেন, “সব বই সবাই পড়ুক। নোংরা বই বাড়িতে এনোইনা।’’[৪৮]

লীলা মজুমদারের ব্যক্তি জীবনে কৈশোর জীবনপর্বে মায়ের দ্বারা যৌন শিক্ষার পাঠ, নিজের লেখালেখিতে উৎসাহ কিংবা বই পড়া নিয়ে মায়ের উদার মনোভাব তাঁর জীবনের ভীতকে অনেকটাই মজবুত করেছিল অনুমান করা যায়। তার সাথে তাদের পারিবারিক জীবনে মায়ের যে বিশেষ ভূমিকা ছিল বোঝা যায়।

আত্মজীবনীকার লীলা মজুমদার জীবনের এককেটা পূর্বে অজস্র টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতা অনুভূতির কথা জানাতে জানাতেই গতিমান জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কোলকাতায় এসে নিজের জীবন যাত্রার পরিবর্তন সম্পর্কে লিখেছেন–

“শিলং এ সাজ পোষাক সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিলাম। কলকাতায় এসে নতুন বন্ধু-বান্ধবদের মতো কাপড়-জামা পরতে ইচ্ছে করত।’’[৪৯] আবার কৈশোর বয়সে হৃদয়ের রোমাঞ্চের কথাও তিনি বলে যান– *“সতেরো বছর বয়স আমার জীবনের মাধুর্যের দিকটা চোখের সামনে একটু একটু করে ফুটে উঠছিল। সদাই উদগ্রীব হয়ে থাকতাম, এই বুঝি রোমাঞ্চময় কিছু ঘটবে।’’*[৫০] এসব ভাবনার মধ্য দিয়ে লেখিকাকে অনেকটাই জানা যায়, বোঝা যায়। জীবনের নানা ঘটনা বৃত্তির কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন সমকালীন সময়ে জাতীয়

রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হবার কথা। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের পর দেশীয় রাজনীতি উত্তাল হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতায়, বয়কট, পিকেটিং-এর মধ্য দিয়ে জাতীয় আন্দোলন গতিপ্রাপ্ত হয়। বিদেশী দ্রব্য বর্জন, স্কুল, কলেজ, সরকারী প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা; সরকারি চাকুরি, উপাধি ত্যাগ ছিল আন্দোলনের অঙ্গ। এই সময় লীলার ব্যক্তি জীবন ও প্রভাবিত হয়েছিল। লীলার পিতা ভারতীয় জরিপ বিভাগের কর্মী ছিলেন তার সাথে রায় বাহাদুর উপাধি পেয়েছিলেন বাবার সরকারি চাকরির কারণে তিনি যে বন্ধুদের কাছের হেনস্থার শিকার হতেন সেকথা তিনি জানিয়েছেন–

"বাবা সরকারি চাকরে পরীক্ষা দিয়ে নিজ গুণে সার্ভে অব ইণ্ডিয়াতে ঢুকে, ক্রমে ক্রমে প্রভিন্‌সিয়্যাল সার্ভিস থেকে ইমপিরিয়েল সার্ভিসে উন্নত হয়েছিলেন। সেটা তত লজ্জার বিষয় ছিলনা- অক্ষমতাতে বাহাদুরি কোথায়? যতটা ছিল বাবার প্রথমে রায় সাহেব, পরে রায় বাহাদুর উপাধি লাভে। ... আসলে আমাদের দেশভক্ত বন্ধ-বান্ধবরা ঐ উপাধির কথা জানতে পারেনি। তাই আমরা বেঁচে গেছিলাম। কিন্তু বাবা কেন সরকারি চাকরি ছাড়ছেনা, তাই নিয়ে গঞ্জনা দিতে ছাড়ত না। মার কাছে একবার কথাটা পাড়লে, মা সোজাসুজি বললেন, "এতো কোনো বিশ্বাসঘাতকতার কাজ নয়। তাছাড়া বাবা কাজ ছাড়লে কি তোরা আর তোদের প্রেমিক বন্ধুরা আমাদের সংসার চালাবি?'' এমন অকট্য যুক্তির কোনো উত্তর হয়না বলে রণে ভঙ্গ দিতে হল।''[৫১]

জাতীয় রাজনীতির এই পর্বে দেশের মানুষ কিরূপ আবেগ তাড়িত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধিতায় নেমে ছিল– তার কথা বলে যায় আত্মজীবনীর এই প্রসঙ্গ। আর সেই আবেগ অনেকক্ষেত্রেই বাস্তবতা কেও যে লঙ্ঘন করত তা বোঝা যায়, মায়ের কাছে পিতার চাকুরি ছাড়ার প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে মায়ের জবার থেকে– *"মা সোজাসুজি বললেন, "এতো কোন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ নয়। তাছাড়া বাবা কাজ ছাড়লে কি তোরা আর তোদের দেশপ্রেমিক বন্ধুরা আমাদের সংসার*

চালাবি।'' [৫২]

লীলা সমকালীন সময়ে বিদেশী কাপড় বর্জন এবং সেই নিয়ে নিজের উচ্ছ্বাসের কথাও লিখেছেন– *"তখন কেউ বিদেশী কাপড় চোপড় এনে স্তূপাকার করে রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দিত।''* মা একবার বলেছিলেন, *"শীতে কাঁপছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েকটা গরীব মানুষ। পুড়িয়ে না ফলে ঐ গরম জামা-কাপড়গুলে ওদের দিয়ে দিলে হত না?''* আমরা তখন জোর গলায় বলেছিলাম *" না, না, হত না। দেশপ্রেমের জন্য সব্বাইকে কষ্ট করতে হবে।''* এখন ভাবি মা মন্দ কথা বলেননি।" [৫৩]

আত্মজীবনীর এই প্রসঙ্গও দেশের রাজনৈতিক কালপর্বকে চিত্রিত করে। তার সাথে এও বোঝা যায় লীলা মজুমদার দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের এই কাল পর্বকে কেবল দর্শক আসনে বসে দেখেন নি নিজেও আন্দোলিত হয়েছিলেন। লীলা মজুমদার আমাদের আরও জানিয়েছেন সমকালীন সময়ে কিভাবে তিনি বন্ধু মীরা দত্তগুপ্তার সহযোগিতায় গান্ধীবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে চরকায় সূঁতো কাটতে শুরু করেছিলেন।[৫৪]

প্রকৃত পক্ষে সমকালীন সময় গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি হিসাবে চরকাকাটা, খাদি শিল্প স্থাপনে গোটা দেশই উদ্বুদ্ধ হতে শুরু করেছিল। লীলা মজুমদারের প্রায় সমকালীন মণিকুন্তলা সেন (১৯১১) ও তাঁর 'সে দিনের কথা' আত্মজীবনীর পাতায় বালিকা বয়সের স্মৃতিতে বরিশালে চরকা ও খাদির কুঠির শিল্পাশ্রম স্থাপনের কথা বলেছেন। *"সেটা বোধ হয় ১৯২৩ সন ছিল কংগ্রেসের একটা অধিবেশন ওখানে হবে। ওই টুকু শহরে এতো বড়ো একটা ব্যাপার যেন শহরময় তোলপাড় ঘটিয়েছিল। ... এই সভায় একটা অদ্ভূত ঘটনা ঘটল। গান্ধীজি এসেই শুনলেন এইটুকু শহরে পতিতা নারীর সংখ্যা প্রায় তিনশত। উনি বললেন, ওই সভায় বিশেষভাবে তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাতে। সেটা করা হল। তাদের বসবাসের জন্য আলাদা জায়গা গান্ধীজির মঞ্চের কাছাকাছি করে*

দেওয়া হল।

আমরা গান্ধীজির ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে। হিন্দিতে তো কিছুই বুঝি না অনুবাদকের সাহায্যে যা বুঝলাম তিনি অসহযোগের কথা বললেন। এছাড়া আলাদা করে ওই পতিতা মেয়েদেরকে কিছু বললেন। তার সারাংশ ছিল, 'তোমরা পতিতা নও – নারী, মাতৃ জাতি। তোমরা দেশের কাজে আত্মদান কর– আমি তোমাদের জীবিকার দায়িত্ব নেব।' যখন তিনি ডাক দিলেন, তোমরা যারা আসবে– আমার কাছে এস' – তখন সত্যিই তাদের মধ্যে থেকে কুড়ি জনের মত উঠে এল। সেদিন থেকে এই মেয়েরা কংগ্রেসের কর্মী হয়ে গেলেন। পনেরো– কুড়ি জনই শেষ পর্যন্ত এল কি না ঠিক মনে নেই শহরে তখন কংগ্রেসের নেতৃত্বে অনেক চরকা ও খাদির কুটির শিল্পাশ্রম খুলে গেছে ওইসব আশ্রমে এরা স্থান পেলেন।''[৫৫]

লীলার ছাত্র জীবনে গান্ধীজির ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে চরকায় সুঁতো কাটার উদ্যোগ নেওয়া সমকালীন সময়ের দেশের রাজনৈতিক গতি ধারারই চিত্র তুলে ধরে। সেদিন দেশ সেবার স্বপ্ন দেখতে বাঙালি মেয়েরা যে পিছিয়ে ছিল না বোঝা যায়।

সমকালীন সময়ে একদিকে যেমন গান্ধীজির নেতৃত্বে *'অসহযোগ'* এর মত নরমপন্থী আন্দোলন বিকশিত হচ্ছিল তার পাশাপাশি একটা চরমপন্থী আন্দোলনের ঢেউ দেশে দেখা দিয়েছিল। লাঠিখেলা অসি শিক্ষার মাধ্যমে দেশের যুবক যুবতীদের বলিষ্ঠ করে তুলে স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল হওয়া ছিল এর উদ্দেশ্য। লীলাও তাঁর ছাত্র জীবনে বন্ধু মীরার প্রচেষ্টায় লাঠিখেলা, অসি শিক্ষার পাঠ নিতে শুরু করেছিলেন। *'পাকদণ্ডী'*র পাতায় লিখেছেন–

"মীরা আমাকে স্বাধীনতা সংগ্রামী করে তোলার জন্য কম চেষ্টা করেনি। কবে ঠিক মনে নেই, হয় ঐ সময়, নয় ২-১ বছর পরেও হতে পারে, ভবানীপুরে ওদের কোন আত্মীয়ের বাড়িতে মহিলাদের লাঠিখেলা ও অসি শিক্ষার ব্যবস্থা

করেছিল। কাঠি- ফড়িং এর মতো চেহারা ছিল দুজনার। যেমনি বেঁটে তেমনি রোগা। ও আমার চেয়েও বেশি। তাতে কি হয়েছে? আমরা আরো উৎসাহী সদস্যা জুটিয়ে মহা আগ্রহের সঙ্গে বিকেলে গিয়ে 'শিরা-মুড়া, দাড়ি-মুড়া' ইত্যাদি করতাম।"[৫৬]

জাতীয় আন্দোলনের এই পর্বগুলিতে বাঙালি মেয়েরা ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেশ সেবার জন্য নিজেকে তৈরী করতে গিয়ে অনেকটাই যেন সাহসী হয়ে উঠেছিল।

লীলা মজুমদারের ব্যক্তি জীবনে পড়াশুনো বরাবরই গুরুত্ব পেয়ে এসেছে জীবনের নানা ঘটনা বৃত্তের মাঝে পড়ুয়া জীবনের কথা তিনি বলে গেছেন। ১৯২৪ সালে লীলা ডায়োসেসান স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ডায়োসেসান কলেজে আই এ-তে ভর্তি হয়েছিলেন। সে সময় কার মেয়েদের পোষাকের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—

"সারাদিন এক সাদা কাপড় চোপড় টেনে বেড়াতে হত। সে পোশাকের ডিজাইন হয়েছিল মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন প্রথম সিংহাসনে চড়েন নির্ঘাৎ সেই সময়ে। ১৯২৪ আমরা তখনো তাঁর সময়কার ভেতরের কাপড় চোপড় পরতাম। 'অন্তর্বাস' কথাটার তখনো চল হয়নি, শুনলে নিশ্চয় একটু অসত্য-অসভ্য মনে হত। আমরা কি পরে কলেজে যেতাম তাই বলি। প্রথমে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একটা সাদা লং ক্লথের সিমিন। তার ওপর কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি অবধি লম্বা লংক্লথের সায়া। ওপর দিকে সেমিজের ওপর ছোট যাতাওয়ালা আঁটা একটা বডির ওপর, কুনইহাতা, কণ্ঠা অবধি উঁচু একটা ব্লাউজ আর সবার ওপরে ভাল কাঁধে পিন দিয়ে আঁটা ব্রাহ্ম- ফ্যাশানের পরা শাড়ি। তখন থেকেই সামনে কুঁচি দিয়ে মাদ্রাজি ফ্যাশানে কাপড় পরার রেওয়াজ শুরু হয়েছিল, কিন্তু বাবার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ও ফ্যাশানটা ভারি অসভ্য, কাজেই দিদি আর আমি এম এ পাস করে স্বাধীন হবার আগে পর্যন্ত ব্রাহ্ম ফ্যাশনে শাড়ি পরেছি পায়ে চোট গোড়ালি পর্যন্ত।

বাড়িতে বাঙালী ধরনের কাপড় আর পায়ে চটি, কিম্বা খালি পা। সে যাই হোক, আমি হলপ করে বলতে পারি আমরা ঐসব পরে যখন অরজিৎভাবে ট্রামে চড়ে এম এ পড়তে যেতাম আর ছেলেদের সঙ্গে ক্লাস করতাম, তখন আমাদের শরীরের কোনও জায়গায় এতটুকু উঁচু-নিচু টক্কর আছে বলে মালুম দিত না। তবে স্বাভাবিক ওজনের চাইতে নিশ্চয় আমরা সের দুই ভারি হয়ে যেতাম। তাছাড়া আরেকটা অসুবিধা ছিল যা ভুক্তভোগী ছাড়া কারো টের পাওয়া অসম্ভব ছিল সেটি হল যে ঐ তলাকার সেমিজটা তার ওপরকার পেটিকোটটা আর সবার ওপরকার শাড়িটার আড়াই ফ্যাঁচ পরস্পরের সঙ্গে মাজে মাঝে এমনি জড়িয়ে যেত যে হাঁটাই দায় হয়ে উঠত। আর গরু তাড়া করলে যে কি হত সে ভবলেও গা শিউরে ওঠে।''[৫৭]

সমকালীন সময়ে বাঙালি মেয়েরা শিক্ষার জন্য ঘড়ের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারলেও পোষাকের বর্মেই আচ্ছাদিত ছিল তাদের স্বাধীনতা।

কলেজ জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়েই লেখিকা বাবার নিয়ন্ত্রণের কথাও স্মরণ করেছেন– *"বাবা আমাদের মাঝে মাধে গড়ের মাঠে হকি ফুটবল খেলা দেখতে নিয়ে যেতে চাইতেন। কিন্তু যখন শেক্সপীয়র রেপার্টরি থিয়েটার এসে প্যাট স্কুলে অভিনয় দেখাল, কলেজ থেকে মেম দলবল নিয়ে টিকিট কেটে দেখতে গেলেন। বাবা আমাদের যেতে দিলেন না। মনে মনে বেজায় রাগ হয়েছিল। মার কাছে গিয়ে খুব খানিকটা গজ্ গজ্ করে চিলাম। মাকে কখনো বাবার বিচারের বিরুদ্ধে একটি কথা বলতে শুনিনি। কিন্তু চোখে বেদনা দেখেছি।''*[৫৮]

প্রমদারঞ্জন রায় সমকালীন শিক্ষিত প্রগতিশীল বাঙালিদেরই প্রতিনিধি ছিলেন কিন্তু বাড়ির মেয়েদের স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি এক পিতৃতান্ত্রিকতার প্রতাপের নিরিখেই পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন, সেখানে লীলার মা সুরমার মতামতেরও মূল্য ছিলনা। তাই লীলা মায়ের স্নেহ ভালোবাসার নানা গুনা গুনের

কথা স্বীকার করেও স্বামীর নিয়ন্ত্রণে চলাকে সমালোচনা করেছেন– *"মাকে কিম্বা মেজদিকে কখনো প্রকাশ্যে স্বামীর সঙ্গে তর্ক করতেও শুনিনি। অবিশ্যি সে ব্যবস্থার আমি খুব প্রশংসা করতে পারছি না।''* [৫৯]

লীলা মজুমদার তার পারিবারিক জীবনেও যে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণের স্বীকার হতেন তার কথাও জানান। কখনো মাসি মেসোর সঙ্গে ঢাকা বেড়াতে গেলে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা থাকলেও সে সুযোগ তিনি পান না। বাড়িতে পোষাক পরিচ্ছদ, আচার আচরণ নিয়ে নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন।

"এত কথা বললাম কারণ বুলুদি থেকে থেকেই বলত, "এই তোদের সবুজ জামার হাতা অত ছোট করে কেটেছিস কেন? পিসিমার বাড়িতে সবাই নিন্দে করছে।'' অমনি মন খারাপ হয়ে যেত। কিম্বা হয়ত বলল, বীনার বিয়ের সময় ওই অল্প চেনা ছোকরা তোর মুখের সামনে যখন দেশলাই জ্বেলে ধরেছিস, ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিয়েছিলি কেন? খুব খারাপ দেখিয়েছিল।'' নাচার হয়ে হয়তো বললাম, "তাহলে কি করা উচিত ছিল?'' [৬০] আমাদের সমাজে মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনে এইরূপ নিয়ন্ত্রণের চিত্র আজকের দিনেও সমান সত্য। বাড়ির ছেলেরা নিজেদের ব্যক্তি জীবনে যতটা স্বাধীন চলাফেরার সুযোগ পায় মেয়েরা তার শিকিভাগও পান না। মেয়েদের প্রতিটি আত্মজীবনীতেই দেখা যায় সমাজের এই দ্বিচারিতার প্রতিবাদ বারে বারেই ফুটে ওঠে। রাসসুন্দরী থেকে লীলা সবার ক্ষেত্রেই।

লীলার ব্যক্তিজীবনের একটা নতুন অধ্যায় শুরু হয় এম এ পাশ করার পর দার্জিলিং-এর মহারাণি স্কুলে শিক্ষকতার জন্য প্রবেশের মধ্য দিয়ে। এম. এ. পাশ করে তার অবশ্য বিলেতে গিয়ে পড়বার ইচ্ছা ছিল কিন্তু যোগ্য প্রার্থী হয়েও সে সময় স্টেট স্কলারশিপের ইন্টারভিউতে বসতে পারেন নি। বাড়ি ছেড়ে ২৩ বছরের লীলার সুদূর দার্জিলিং এ যাবার একটা কারণ যে প্রেমিকের সঙ্গে দূরত্ব তৈরির ছিল লেখিকা খোলামেলাভাবেই জানিয়েছেন। অবশ্য নাম তিনি উল্লেখ

করেন নি। লীলা মজুমদারের কথায়–

“বলা বাহুল্য অক্ষত হৃদয়ে আমার তেইশ বছর বয়স হয়নি। সেকালের অনেকের মতে ২৩-এ মেয়েদের বিয়ের বয়স পার হয়ে যায়। আমাদের পরিবারের সবাই আলাদা। মেয়েরা বড় বেয়াড়া, যাদের কম বয়সে ধরে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারা কেউ কেউ অবাধ্য ঘোড়ার মতো পা ঠুকতে ঠুকতে চোখের সাদা দেখাতে দেখাতে চাদ না তলায় গেছিল। এবং সক্কলে শ্বশুরবাড়িতে সুনাম কিনেছিল। মা কিন্তু বিয়ে টিয়ে বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন না। কোন সম্বন্ধ এলে এমনি বাগিয়ে দিতেন, আমাদের জিজ্ঞাসাও করতেন না। কিন্তু আমার একজনকে ভালো লাগত। এবং আমাদের বাড়ির সকলেও তাকে ভালো বাসতে আরম্ভ করে দিয়েছিল।

খুব যা তা ছিল না সে মাথায় লম্বা, রং ফর্সা দেখতে সুন্দর, স্বভাব কোমল, ব্যবহার মিষ্টি সুকুমার, কমনীয়, সাহিত্যানুরাগী সদ্বংশ জাত, আমার চেয়ে বছরের বড় আমি মনে মনে মুগ্ধ। একটুখানি মন জানাজানি, দুটি সলজ্জ কথা, পৃথিবী টাকে স্বর্গ মনে হয়েছিল। কিন্তু যতই দিন যায় ততই বুঝি সে বড় ছেলে মানুষ, বড় কোমল। আমার আরো কড়া ওষুধ দরকার। কিন্তু সে কি মায়া, তার মনে কষ্ট দিতে বুক কাঁপে। চলে না গিয়ে উপায় ছিল না।”[৬১] তার সাথে পারিবারিক জীবনের আবদ্ধতাগুলি থেকে যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষ ছিল আভাসেই যেন বলে যান– *“স্টেশনে সবাই এসেছিল বিদায় জানাতে হাসি, গল্প, নানা রসিকতা। ট্রেন ছেড়ে দিল, আমি আমার পুরনো জীবন থেকে শেকড়গুলো উপরে নিলাম। নিজে বুঝিনি। কিন্তু আসলে তখনি আমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছিল। চারদিক থেকে কিসের একটা বেড়া খসে গেল, আমি মুক্তি পেলাম।”*[৬২]

যে আত্মমুক্তি সন্ধানে আকাঙ্ক্ষায় লীলা দার্জিলিং-এ পারি জমিয়ে ছিলেন তা কিছু সেখানে তিনি পান না। ব্রহ্ম মেয়েদের দ্বারা পারিচালিত এই স্কুলে ব্রাহ্ম ধর্মের আচার আচরণ পালনের, বাধ্য বাধকতা, নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা তাকে বিব্রত

করেছিল। লীলা তার উপলব্ধির কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন–

"সত্যি কথা বলতে কি মহারাণী স্কুলের শিক্ষিকাদের মধ্যে একটা উগ্র ব্রাহ্ম ভাব ছিল। হয়তো সেই জন্যেই বাবা পর্যন্ত আমার দার্জিলিং যাওয়া সমর্থন করেছিলেন।'' [৬৩]

লীলার উপলব্ধিতে দার্জিলিং-এর মহারাণী স্কুলের শিক্ষিকাদের উগ্র ব্রাহ্মবাদ পিতৃতান্ত্রিকতার পরিপুরক। তবে এটা একটা দিক যে আমাদের সমাজে দীর্ঘকাল থেকেই ধর্মীয় বিধি নিষেধ আচার আচরণের বাধ্য বাধকতা সমাজকে নারীকে এক প্রকার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেছে।

দার্জিলিং-এর মহারাণী গার্লস স্কুলে পড়াতে এসে লীলার পূর্ণ অর্থে আত্ম মুক্তি না ঘটলে ও নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার সুযোগ পেয়ে যান। লিখেছেন- *"নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করাই যদি আমার উদ্দেশ্য হয়ে তাকে, তার জন্য প্রচুর সময় পেয়েছিলাম। নিজের বিষয়ে একটা আবিষ্কারও করে ফেলেছিলাম। কারো প্রভুত্ব আমি সইতে পারি না। কেউ হুকুম দিলে আমি বিগড়ে যাই অর্থাৎ কোনো প্রতিষ্ঠানের কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজের আমি উপযুক্ত নই। কেবলি মনের সঙ্গে মনের মিল খুঁজি। সারা জীবন ধরে এই প্রমাণ পেয়েছি। এর মধ্যে অহংকারের কথা নেই। অপর পক্ষের যুক্তি যদি গ্রহণযোগ্য মনে হয়, সর্বদা মত বদলাতে প্রস্তুত থাকি। কিন্তু আর কেউ বলল বলে কোন কিছু মেনে নিতে পারিনি। এই খানেই বাবার সঙ্গে আমার বিরোধের মূল।''* [৬৪] কোনো আত্মজীবনীকারের নিজের সঙ্গে পরিচয় করানোর এর থেকে সুন্দর উদাহরণ হয়তো হয় না। আত্মজীবনীকার লীলার আত্ম উপলব্ধির এই পাঠ প্রতিটা মানুষের জীবনেই সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। আর লীলার 'প্রভুত্ব'কে না মানতে পারার যুক্তিতে নিজের প্রতিষ্ঠানিক দায়িত্ব গ্রহণে ব্যর্থতার স্বীকৃতি তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটা দিকের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় করায়। এখানে বলবো কোনও সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বই কোন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বের আড়ালে থাকা প্রভুত্বকে মেনে নিতে পারেনা। লীলা মজুমদার

যে অল্প বয়স থেকেই সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তা আমরা জানি। অনুমান করা যায় লীলার সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের উদ্যোমী স্বভাবই তাকে প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব গ্রহণের পথে বাঁধাদান করেছিল। তাড়িত করেছিল সৃষ্টিশীলতার পথে এগিয়ে যেতে। তাই হয়তো লিখছেন- *"সত্যি কথা বলতে কি অধ্যাপনা আমার ভালো লাগত না। এ সত্য আবিষ্কার করে নিজেই স্বম্ভিত। আমি কেবল তৈরি করতে চাই, নতুন কিছু বানাতে চাই। কতকগুলো অপোগণ্ড শিশুকে অন্যের লেখা বই থেকে অন্যের দ্বারা নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অভ্যাস করাতে গিয়ে আমার হাঁপ ধরত? উঁচু ক্লাসের অঙ্ক আর ইংরাজি পড়াতে বেজায় খারাপ লাগত। সারা সপ্তাহে মাত্র দুটি ক্লাস আমি উপভোগ করতাম : একটি হল ৬-৭ বছরের ছেলে মেয়েদের গল্প বলা আর একটি হল তাদের ছবি আঁকার ক্লাস। হয় বানিয়ে গল্প বলতাম নয় তো রামায়ণ-মহাভারত থেকে মজার মজার ঘটনার কথা বলতাম। ছবি আঁকার ক্লাসে বলতাম বাগান থেকে যা খুশি দেখে এসো বা নিয়ে এসো তারপর সেটিকে আঁকো। এ দুটি ক্লাস ওরা বেশি উপভোগ করত, নাকি আমি করতাম জানি না। ছোট ছেলে মেয়েগুলোকে বড্ড ভালো লাগত।''*[৬৫] আসলে লীলার সৃষ্টিশীল মনের বিকাশ-পাঠ্যপুস্তকের বাঁধা ধরা গণ্ডির বাইরে ৬-৭ বছরের স্কুলের শিশুদের গল্প বলা ছবি আর আঁকার মধ্যে ঘটেছিল।

দার্জিলিং এর মহারাণী গার্লস স্কুলে লীলার অধ্যাপনা করবার পদ্ধতি অন্য শিক্ষকদের কাছে জনপ্রিয় হয়নি। লীলা জানিয়েছেন তবে সেই কথাটি জানাতে গিয়ে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব অভিমতের প্রকাশ ঘটেছে । যার গ্রহণ যোগ্যতা প্রসঙ্গে যে কোন শিক্ষাবিদকেই হয়তো ভাবতে বাধ্য করবে। লীলা লিখেছেন- *"মিস বোস গিয়ে হেম-মাসিমার কাছে নালিশ করে ছিলেন যে আমি ডিসিপ্লেনের ধার ধারি না। বোকা মেয়েরা পড়া না বুঝলে তাদের পাশে বসে, তাদের পিঠে হাত রেখে, বুঝিয়ে দিই। কমলাদি গিয়ে নালিশ করলেন, আমার গল্প বলার আর ছবি-আঁকার ক্লাসে বড্ড হট্টগোল হয়। হেমমাসিমার কাছেই কথাটা শুনলাম।*

একটুও অসন্তোষ প্রকাশ করলেন না। আমিই বরং অসহিষ্ণু হয়ে বলতাম, 'ঘণ্টা পড়লেও ওরা উঠতে চায় না।' হেমমাসিমা একটু হাসলেন। সে-হাসির মানে বুঝতে আমার একটুও কষ্ট হল না- 'অবিশ্যি ছাত্রদের খুশি করাই অধ্যাপনার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।' আমি আবার মনে করি ঐ খুশি হওয়ার ওপর দিয়েই অনেক শিক্ষা পাচার করে দেওয়া যায়।''[৬৬]

ঘটনা ধারার বিচ্ছিন্ন বিবরণের মধ্যে লীলা মজুমদার কখনো জানিয়েছেন দার্জিলিং-এ থাকাকালীন সময়ে তাঁর বড় মাসি মেসো তাঁদের মেয়ে লোটনের আসার কথা। এই সময়কার একটা ঘটনার কথা লীলা বলেছেন। যার থেকে তার মনোবৃত্তির পরিচয় ফুটে ওঠে। লীলার বড় মাসির মেয়ে নোটন কোন যবন পাত্রকে পছন্দ করেও মনস্থির করতে পারেনি। নোটনের পিতা অর্থাৎ লীলার মেসোমশাই জানিয়ে রেখেছিলেন নোটন সেই পাত্রকে বিবাহ করলে পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। লীলার কাছে মতামত চেয়েছিল নোটন। লীলা লিখেছেন- *"নোটন আমার পরামর্শ চাইতে এল। আমি বললাম, এ আবার একটা সমস্যা নাকি! আমি যদি কাউকে ভালোবাসতাম এবং অন্য কোনো আপত্তির কারণ না থাকত, তাহলে কারো কথা শুনতাম না। কিন্তু মোটন মন ঠিক করতে পারেনি। সে পাত্র এক বছর অপেক্ষা করে অন্য মেয়ে বিয়ে করে আমাদের জীবন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছিল।''*[৬৭] লীলা মজুমদার যে ব্যক্তি জীবনের সিদ্ধান্তগুলির ক্ষেত্রেও স্বাধীনচেতা মনের অধিকারী বোঝা যায়। পরবর্তীতে নিজের বিয়ের ক্ষেত্রেও তিনি এই স্বাধীনচেতা মনেরই উদাহরণ দিয়েছিলেন। পরিবারের অমতে বিয়ে করেছিলেন দন্ত চিকিৎসক এস কে মজুমদারকে। লীলার বিবাহের প্রসঙ্গটিতে আমরা পরবর্তীতে আসবো। লীলার দার্জিলিং-এ কাটানোর আরও স্মৃতির মধ্যে আছে সেসময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দার্জিলিং-এ আসবার ঘটনা। লিখেছেন– *"রবীন্দ্রনাথ এই সময় দলবল নিয়ে দার্জিলিং-এ এসেছিলেন। ম্যাকিনটাশ রোডে আশানটুলি এবং তার পাশেই আরেকটা বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল।''*[৬৮]

রবীন্দ্রনাথ কে কাছে পাওয়ার সুযোগ সে সময় লীলা ছাড়েন নি, লিখেছেন- *"প্রায় রোজ গেছি আশানটুলিতে, রবীন্দ্রনাথকে দেখার সুযোগ ছাড়ি কি করে?"*[৬৯] এই সকল স্মৃতি আমাদেরকে লেখিকার সামাজিকবোধের পরিচয় দান করে। লীলার রবীন্দ্র দর্শনের সুযোগ আমাদের কাছেও রবীন্দ্র পরিচিতির নতুন পাঠ নিয়ে এসেছে। লীলার বাল্যবন্ধু বুবু যিনি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্র ছিলেন তার বিয়ে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের কথা লীলা লিখেছেন- *"দেখতাম রবীন্দ্রনাথ ও বারি আমুদে মানুষ। একদিন আমি গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, তোমর বন্ধু যে মাদরাজিতে আজ রাজি। নাকি এক দক্ষিণী আইসিএস ঠাকুর বাড়ির মেয়ে বিয়ে করতে চান, না পেলে ঠাকুর বাড়ির দৌহিত্রীতেও রাজি। তা বুবু কিছুতেই মত দিচ্ছেনা।"* [৭০] স্মৃতির বিচিত্রতায় এভাবেই জীবনের নানা রঙের অনুপ্রবেশ ঘটেছি *'পাকদণ্ডী'*তে।

দার্জিলিং-এর স্কুলের পরিবেশ লীলার অপছন্দ ছিল বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন আর সেই সুযোগটি এসেছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার জন্য আহ্বানে। রবীন্দ্রনাথ লীলাকে এক বছরের জন্য শান্তিনিকেতনের শিশু-বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বান লীলাকে প্রবল উৎসাহী করলেও পারিবারিক বিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। লিখেছেন- *"মা হতাশ, বাবা রেগে চতুর্ভুজ! শান্তিনিকেতনের ওপর বাবা হাড়ে চটা ছিলেন। যতসব লম্বা-চুলো, চিবিয়ে কথা বলা ন্যাকার দলের আবাস। তার ওপর এরকম কথায় কথায় মত বদলানোর কোনো মানে হয় না।"* [৭১] রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তিত্বের দ্বারা শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার পেশায় লীলার আহ্বান পাবার ঘটনায় লীলার বাবা-মার বিশেষত বাবার বিরোধী হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে আমরা শিক্ষিত সংস্কৃতিবান এই পরিবারের মেয়েদের স্বাধীন মতামত গ্রহণে যে অবরোধ ছিল তারই পরিচয় পাই। তবে লীলা এই অবরোধগুলি উপেক্ষা করেই শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনের অভিজ্ঞতা লীলার মনে শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে পিতার ধারণার বিপরীতে নতুন ধারণার জন্ম দেয় *'পাকদণ্ডী'*তে তারও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে দেখি। লীলা লিখেছেন- *"আমার বাবা বলতেন ওখানে যতসব মেয়েলীপনা। আমি রেশমি জোব্বা পরে গলায় ফুলের মালা পরে রবীন্দ্রনাথকে বসে থাকতে দেখতাম, বলিষ্ট দেহ, তীক্ষ দৃষ্টি, দৃঢ় কণ্ঠ, যেন পৌরুষের প্রতিমূর্তি। ফুলের মালা পরলে কি পৌরুষ কমে?''* [৭২]

পিতার মতামতের বাইরে লীলার মনে নিজস্ব মতামতের জন্ম নেওয়া গভীর দ্যোতনাবাহী নিঃসন্দেহে। আমরা যেন দেখতে পাই বিশ শতকের এক বাঙালি নারী পুরুষের দেখানো পৃথিবীর বাইরে নিজস্ব পৃথিবীর সন্ধান করে নিচ্ছে আবার আরেকটা দিকও লক্ষ করা যায় লীলার বাড়ির বাইরে বেড়িয়ে এসে শিক্ষকতার পেশায় যুক্ত হওয়া কোন অ্যাডভেঞ্চারের অভিলাস থেকে নয়, এর পেছনে সত্যিকার অর্থেই কাজ করেছিল স্বনির্ভরতার প্রশ্ন, স্বাধীনভাবে বাঁচার স্বপ্ন। শান্তিনিকেতনে বিনাপারিশ্রমিকে কাজ করতে আসা বাল-বন্ধু পূর্ণিমার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন- *"সে মিনি-মাগনা পড়াবে। তার অভিভাবকদের মতে মেয়েদের পরনির্ভরশীল হতে হয়। নইলে তাদের পুরুষ আত্মীয়দের মনে থাকে না। আমার মাইনে ঠিক হল ৮৫ টাকা, তার থেকে হোস্টেলে খরচ ২০ টাকা কাটা হত। বাকিটা ওস্তাদ বলে একজন চাপরাশি আমার হাতে নগদ দিয়ে, সই করিয়ে নিত। আমি সন্তুষ্ট ছিলাম। বাপের বাড়িতে কে আমাকে মাসে মাসে ৬৫ টাকা দিত?''* [৭৩]

স্পষ্টতই বোঝা যায় লীলা বন্ধু পূর্ণিমার মত বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে বাড়ির পুরুষ আত্মীয়দের কাছে নির্ভশীল হয়ে থাকতে চাননি। লীলার রোজগারের *'৬৫ টাকা'* তাঁর কাছে যেন মূল্যবান হয়ে উঠেছে স্বনির্ভরতার প্রশ্নে। আর এই স্বনির্ভরতাই তো একজন নারীর কাছে পুরুষের তৈরি সামাজিক কাঠামোর বাইরে এগিয়ে চলার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কাজ করে। লীলা বন্ধু পূর্ণিমার বিপরীতে

'পারিশ্রমিক' গ্রহণ করে এই 'প্রথম পদক্ষেপ'টাই যেন নিতে চেয়েছেন।

শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার কাজ করতে এসে লীলা যে কাঙ্ক্ষিত মুক্তি পাননি সে কথা *'পাকদণ্ডী'*র পাতায় লিখেছেন। শান্তিনিকেতনের পরচর্চা পরিবেশ তাকে বিব্রত করত একজায়গায় লিখেছেন- *"একটা শিক্ষা আমার অল্প দিনের মধ্যেই হল। আশ্রমে যত স্বাধীনতাই থাকুক না কেন,* সঙ্গে সঙ্গে এত বেশি পরচর্চা যে নিজের কানকে বিশ্বাস করা যেতনা। সামনা সামনি বেশির ভাগ লোক যা বলে, পেছনে তার একেবারে উল্টো কথা বলে। পরের আচরণে খুঁৎ দেখলে মুখে রাগমাগ করলেও, বেশিরভাগ লোক ব্যাপারটাকে বেজায় উপভোগ করে। দয়া-মায়া-ক্ষমা এসব জিনিসের এত অভাব আগে জানিনি। একদিন উত্তরায়ণে কবির কাছে গিয়ে শুনতে পেলাম কলেজের উচ্চপদস্থ একজন অধ্যাপক, বিএ ক্লাসের একজন মেয়ের নামে নালিশ করছেন। তাই নিয়ে উপস্থিত পুরুষ ও মহিলারা-যাঁদের অনেকের সঙ্গে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজের কোনও সম্পর্ক ছিল না- নানারকম বিরূপ মন্তব্য *করলেন। মেয়েটিকে ডাকা হল না। জিজ্ঞাসা করা হল না, যখন তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ওকে চিঠি লিখে শান্তিনিকেতন থেকে চলে গেছিলাম। আমার জ্ঞানচক্ষু একটু একটু করে ফুটছিল।''*[৭৪] আত্মজীবনীকার লীলা যে স্পষ্টবাদী হয়ে জীবনের নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন এ যেন তারই একটি নিদর্শন। তিনি মুক্ত মনের অধিকারী ছিলেন শান্তিনিকেতনে এসে পরচর্চার পরিবেশ মেনে নিতে পারেনি। ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি যেন অনেকটাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে চাইতেন। যুক্তিতেই বুঝতে চেয়েছিলেন জীবনকে।

লীলাকে আমরা কিন্তু দ্বান্দ্বিক হয়ে উঠতেও দেখি। লেখেন- *"পরে ভেবেছি ব্যক্তিগত আক্রোশ, কিম্বা একটা ছোটগোষ্ঠীর মধ্যে রেষারেষী হিংসা-দ্বেষ, পরনিন্দা, নিজের সুবিধা করে নেবার চেষ্টা এসব হবেই। কিন্তু এতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা আদর্শ এতটুকু ম্লান হয়না।''*[৭৫] আত্মজীবনীকারের এইরূপ দ্বান্দ্বিক মনের অবস্থানের কারণে আমরা অনেকটাই প্রকৃত সত্যের কাছাকাছি চলে আসি। লীলার

বোধশক্তিকেও মান্যতা দিতে হয় একটা ছোটগোষ্ঠীর দ্বারা শান্তিনিকেতনের মত বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানের বিচার তিনি করতে চাননি। লীলার লেখনিতে সেদিনকার শান্তিনিকেতনে শিক্ষার আদর্শের, কর্মসংস্কৃতির নানা ছবি ফুটে উঠেছে। একদিনের ঘটনার কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেদিন ১৩-১৪ বছরের ছেলে-মেয়েদের শেলির স্কাইলার্ক পড়িয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেওয়া নেই ক্লাসের বর্ণনা দিয়েছেন- *"ইংরাজি কথাগুলো পাঠ করলেন, পড়ালেন বাংলায়। সেই ক্লাসটাই একটা কাব্য হয়ে উঠল। আজও মনে পড়ে কবির ঘাড়ের ওপর দিয়ে নীল আকাশে ছিল উড়ছিল।"*[৭৬] এভাবেই কখনো নন্দলাল বসুর নেওয়া আঁকার ক্লাসের বর্ণনা দিয়েছেন। পরিচয় দিয়েছেন- জাপানী উদ্ভিদবিদ কাসাহারার যিনি বড় বড় আম গাছ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় লাগাতেন, আমেরিকা থেকে আগত ইংরেজির অধ্যাপক টাকারের, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর যিনি পৃথিবী ভুলে ডেস্কের সামনে বসে বসে অভিধান রচনা করতেন ডঃ আলি। যিনি শ্রীনিকেতনের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পে ম্যালেরিয়া দূরীকরণের কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিনকার শান্তিনিকেতনবাসী আরও অনেকের কথা বলেছেন। শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির পরিচয় ও বাদ যায়নি- লাল কাকড়ের উঁচুনিচু জনহীন ভূমি, তাল-বট-অশ্বত্থ আম গাছে ঘেরা শান্তিনিকেতন, গুবগুবি পাখি, হাঁড়িচাচা পাখি সব মিলিয়ে প্রকৃতির ছত্রছায়ার রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে দেশ বিদেশ থেকে আসা অনেক মানুষের আত্মত্যাগে সেদিন শান্তিনিকেতন যে শিক্ষা সংস্কৃতিচর্চার এক অন্যতম পিঠস্থানে পরিণত হয়েছিল আমরা দেখতে পাই। তবে লীলা সেদিনের শান্তিনিকেতনের ভালমন্দ দুটি দিকের কথাই বলেছেন। যেমন সমালোচনা করেছেন পরচর্চার পরিবেশের তেমনি ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা তৈরী বিচার সভার, গান্ধী দিবসে আশ্রমের পরিচারকদের ছুটি দিয়ে অধ্যাপক ছাত্রছাত্রী মিলে সব কাজ করবার মত সংস্কৃতির কথাও বলেছেন। এই সকল পরিচয়ের কারণে *'পাকদণ্ডী'* একটি অন্যতম মানবিক দলিলে পরিণত হয়েছে। হারিয়ে যাওয়া এই দিনগুলির পরিচয় থেকে আমরা

অনাগত ভবিষ্যতের পাথেয় খুঁজে পাই।

লীলা মজুমদার শান্তিনিকেতনে অল্প দিনই ছিলেন। যে এক বছরের কাজের প্রতিশ্রুতিতে তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন তা পূরণ না করেই ফিরে আসেন। স্পষ্ট করে কারণ না বললেও শান্তিনিকেতনে গিয়ে যে, ব্যক্তিগতভাবে পরচর্চার শিকার হওয়া, নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের বাঁধাগুলি তাঁকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল তা স্পষ্ট। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন পরচর্চার শিকার হওয়ার একটি ঘটনার কথা বলেছেন। যার থেকে সে দিনকার ঘরের বাইরে স্বাধীন বিচরণকারী মেয়েদের সম্পর্কে সমাজ মানসিকতারও পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনাটি ঘটেছিল শান্তিনিকেতন-এর বিএ ক্লাসের ছাত্র গোবর্ধন মাপরা দোলের মেলা থেকে ফুলের মালা কিনে লীলাকে পরিয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে। লীলা মজুমদারের কথায়- *"রবীন্দ্রনাথ তখন ইরাণে। ছোট মুখে ছোট কথাই বটে। বারো-তেরো বছরের ছেলে মেয়েদের কোপাই নদীর ধারে পিকনিকে নিয়ে গেলাম সারাদিন আনন্দ করে ফিরে এলাম। পরদিন কবি মুচকি হেসে বললেন, 'তোমরা নাকি কাল মিকসড বেদিং করে এসেছিলে?' ঝপ করে মনের মধ্যে আনন্দের বাতিটা নিবে গেল। দোলের মেলা থেকে আমার বিএ ক্লাসের ছাত্র গোবর্ধন মাপরা আমাকে একটি সুন্দর ফুলের মালা কিনে গলায় পরিয়ে দিল। তাও ডালপালা গজিয়ে, সব মাধুর্য হরণ করে কবির কানে গিয়ে উঠল। বৃহৎ যাঁরা ছিলেন, নমস্য যাঁরা, আমার আজীবনের অনুকরণীয় আদর্শ যাঁরা, আমার প্রিয় বন্ধু যাঁরা ক্ষিতি মোহন সেন, নন্দলাল, প্রভাত দা, তেজুদা, গোঁসাইজী, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুশেখর ভট্টাচার্য এঁরাও ঐ পরিবেশে দীর্ঘকাল, কেউকেউ আজীবন কাটিয়ে দিলেন। হয়ত এসব তুচ্ছ জিনিস লক্ষই করলেন না, তার কারণ তাঁরা তাদের কর্মজীবনের দিশা পেয়েছিলেন, কিন্তু আমি পাই নি।"* [৭৭] কোন ছাত্র একজন শিক্ষিকাকে গলায় মালা পরিয়ে দেওয়ার জন্য– 'তোমরা নাকি কাল মিকসড বেদিং করে এসেছিলে?'- এইরূপ আখ্যা দেওয়া ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককেই কলুসিত করে

তোলে। এই ঘটনায় লীলার ব্যথিত ওয়ে ওঠার কারণটিকে যুক্তিযুক্তই মনে হয়। তবে এর মধ্যে আমরা সেদিনের ঘরের বাইরে স্বাধীন বিচরণকারী মেয়েদের সম্পর্কে সমাজের সন্দেহপ্রবণ মনোভাবকেই যেন খুঁজে পাই। বা এভাবেও দেখা যায় সমাজ একজন নারীর সহজ বিচরণকে খোলা মনে মেনে নিতে পারছে না। এই ঘটনায় লীলা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন। শুধু তাই নয় লীলা শান্তিনিকেতনে গিয়ে যে আরও বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণের শিকার হয়েছিলেন তাও দেখা যায়। লীলা সেখানকার শিক্ষিকা ছিলেন কিন্তু মেয়েদের বোর্ডিং এর হেমবালাদি যে লীলাকে রাত ন'টার পর বোর্ডিং থেকে বাইরে যেতে বাঁধা দিতেন সে কথা লীলা লিখেছেন।[৭৮] মেয়েদের ক্ষেত্রে সমাজের নিয়ন্ত্রণগুলি থেকেই যায়। নিয়ন্ত্রিত জীবন, পরচর্চার শিকার হয়েই হয়তো লীলা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সময়ের আগেই শান্তিনিকেতনের চাকুরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথ কিংবা রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন সম্পর্কে লীলার মনে যে কোন বিরুপতা ছিলনা তার বহিঃপ্রকাশই ঘটেছে আত্মজীবনীতে। লীলা জীবনের একটা গঠনমূলক পর্ব হিসাবেই গ্রহণ করেছেন শান্তিনিকেতনে কাটানো সময়টাকে। লিখেছেন- *"এর আগেও কত সুন্দর জায়গায় থেকেছি, প্রকৃতির লীলাভূমি শিলং-এ শৈশব কাটিয়েছি, পরে দার্জিলিংয়ের মহান সুন্দর দৃশ্য দেখেছি কিন্তু শৈশবে ছাড়া প্রকৃতি কোথাও এমন করে আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করেনি। এখানে আমার সমস্ত অনুভূতিগুলো সচেতন সজীব হয়ে উঠেছিল। আমার পুরনো সমস্যা যা কিছু ছিল, সমস্তই আপনা থেকে সমাহিত হয়ে গেছিল। সমস্যার সমাধান মন নিজে করে, বাইরে থেকে হয় না। এখানে আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলাম। আমি নতুন করে টের পাচ্ছিলাম ২৩ বছরেও বিশেষ কিছু করিনি, কিন্তু লেখা ছাড়া আমাকে দিয়ে কোনও কাজ হবে না। বাংলায় লেখা। যে ভাষায় বাঙালী শিশুরা মাকে ডাকে, বাঙালী বুড়োরা মরার সময় ভগবানকে ডাকে, সেই সহজ ভাষায় লিখতে হবে। কোন বই পড়ে সে ভাষা শেখা যাবে না। শান্তিনিকেতনে এক*

সঙ্গে এত মানুষকে এত ভাল লেগেছিল, সেখানে, এত আজীবনের বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিল যে বার বার বলও মন ওঠে না যে, ঐখানে আমার মনের নিবাস।'' [৭৯] পলে পলে নিজের হয়ে ওঠার, নিজেকে গড়ে তোলার এইরূপ স্বীকারোক্তিগুলি মানবীয় বন্ধন গড়ে তুলেছে, আত্মজীবনীকার ও তার পাঠকের মধ্যে।

১৯৩২ সালে শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এসে লীলা মজুমদার কিছু দিনের জন্য আশুতোষ কলেজের মহিলা বিভাগে অধ্যাপনার কাজ করেন পরে অবশ্য কলেজের পুরুষদের বিভাগেও পড়িয়েছিলেন। এই কলেজে শিক্ষকতা জীবনের অভিজ্ঞতার কথা লীলা মজুমদার *'পাকদণ্ডী'* বইটিতে বিশেষ কিছু না লিখলেও '*আর কোনোখানে*' বইটিতে এর পরিচয় আছে। খুঁজে পাওয়া যায় পুরনো এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অতীতের দিনগুলির ছবি। এই ছবিগুলি থেকে সমকালীন সময়ে স্কুল কলেজে পড়তে আসা মেয়েদের অবস্থারও পরিচয় পাওয়া যায়। আশুতোষ কলেজে পড়ানোকালীন লীলা অল্পদিনের জন্য গোখেল মেমোরিয়াল কলেজে পার্ট টাইমে '*লজিক*'ও পড়িয়েছিলেন। পাকদণ্ডীতে অবশ্য লীলা মজুমদার এর উল্লেখ করেন নি। আর কোনওখানে-তে লীলা গোখেল মেমোরিয়াল স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সরলা রায়ের ঐ প্রতিষ্ঠান গড়তে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার কথা, মেয়েদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলোর স্বপ্নের কথা বলে যান। লীলা মজুমদার এর কথায়-

"গোখেল মেমোরিয়াল স্কুল ও কলেজ ইনিই একরকম একা হাতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গুরুদেব যে পরিপূর্ণ মানুষ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, সরলা রায়ের চোখেও সেই স্বপ্ন ছিল। তিনিও চাইতেন পরিপূর্ণ নারী তৈরি করতে। বলতেন শুধু পড়াশুনো দিয়ে তা হয় না। শতকরা নিরানব্বুই জন মেয়েই সংসার করবে, অথচ স্কুলের পাঠ্য তালিকায় তার জন্যে কোনও প্রস্তুতিই নেই। পাস করবে, কিন্তু রাখতে ছেলেমেয়ে দেখতে, সুন্দর করে সংসার সাজাতে শিখবে না। তাঁর স্কুলে সেই চেষ্টাই করতেন, যাতে নিটোল

একটি জীবনের জন্য মেয়েরা প্রস্তুত হয়। স্বপ্নটাও ছিল, চেষ্টা ও ছিল তাই আমার ভালো লাগল। দেখতাম মোটাসোটা মানুষটি, চুল পাক ধরেছে, থান পরনে। তবু একটু মেম মেম ভাব। চেষ্টাকে কর্তব্য মনে করতেন তাই করে যেতেন, লোকের মতামতের ধার ধারতেন না। একটার পর একটা সিগারেট খেতেন, সিগারেটের টিন নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। সে সময় এটা একটা অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। অনেকে নিন্দা করত।

কিছু না থেকে এতবড় স্কুল-কলেজ করলেন। অক্লান্তভাবে খেটে টাকা তুললেন। তাঁর অসাধ্য কিছু ছিল না। তখন বৃটিশরাজের যুগ। কজন বড় ব্যবসাদার একটা শর্তে স্কুলের জন্য মোটা চাঁদা দিতে চেয়ে ছিলেন। শর্তটা হল কোনও একটা ফ্যাশনেবল্ অনুষ্ঠানে তাঁকে বড় লাটের পাশে বসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সরলা রায়ও কম ছিলেন না; ব্যবসাদারকে বড়লাটের পাশে বসার ব্যবস্থা করে দিলেন, স্কুলের তহবিলে মোটা টাকা জমা হল।

তাঁর স্কুলে সামান্য পার্ট টাইম অধ্যাপিকা হয়েও গর্ববোধ করতাম।''[৮০]

আত্মজীবনীকার লীলা মজুমদারের প্রচেষ্টায় আমরা সরলা রায়ের মত ব্যক্তিত্বদের যেন নতুন করে খুঁজে পেলাম। এই সকল পরিচয় থেকেই নতুনভাবে নির্মীত হয়ে চলে সমাজ ইতিহাসের পাঠ। এখানেই একটা আত্মজীবনীর তাৎপর্য। এর মধ্যদিয়ে আত্মজীবনীকার লীলা মজুমদারের মনবৃত্তিটাও কিন্তু আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৯৩৩ সালের ১৯ শে ফেব্রুয়ারি সে সময়ের লীলা রায়ের বিবাহ হয় দন্ত চিকিৎসক ড° এস কে মজুমদারের সঙ্গে। আর এই বিবাহকে কেন্দ্র করে পিতা প্রমদারঞ্জন রায়ের সঙ্গে লেখিকার চিরদিনের মত সম্পর্কচ্যুতি, খোলামেলাভাবেই বলেগেছেন জীবনের এই সংকটটির কথা। হিন্দু পাত্রকে অব্রাহ্ম মতে বিবাহ করেছিলেন লীলা মজুমদার এটাই ছিল তাঁর পিতার সঙ্গে বিরোধের কারণ। প্রমারঞ্জন লীলাকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করেছিলেন এমনকি মুখ দেখতে পর্যন্ত

অস্বীকার করেছিলেন। পিতার প্রতি এই নিয়ে লীলা মজুমদারের অভিমান ছিল। এক জায়গায় লিখেনে- *"বাবা যখন জাত ভেঙে, ব্রাহ্ম মতে, আমার মাকে বিবাহ করেছিলেন, ঠাকুমা আর বড় জ্যাঠামশাই মত দিয়েছিলেন, কিন্তু নিশ্চয় খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। তবে বাবার সুখটাই তাঁদের কাছে বড় ছিল। কিন্তু এসব ঘটনার প্রায় ত্রিশ বছর পরে আমি যখন আমার হিন্দু স্বামীকে গৌর অ্যাক্ট অনুসারে রেজিস্ট্রি করে বিবাহ করেছিলাম, বাবার সম্মতি বা আশীর্বাদ, বা ক্ষমা পাইনি।''* [৮১]

প্রমদারঞ্জন রায় নিজে জাত ভেঙে বিবাহ করেছিলেন কিন্তু নিজের মেয়ের ক্ষেত্রে তিনি তা মেনে নেন নি। পিতা প্রমদারঞ্জন রায়ের জাত ভেঙে বিবাহের প্রসঙ্গ তুলে ধরে লীলা মজুমদার আমাদের সমাজের পিতৃতান্ত্রিক গোড়া চরিত্রকেই আরও বেশী করে প্রকট করেছেন। আমাদের সমাজে এটাই দেখা যায় পুরুষ নিজের জীবনে যে বিষয়কে স্বাভাবিক মনে করে তা নারীর ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে অপরাধ। আত্মজীবনীর আরও বেশ কয়েক জায়গায় লেখিকা পিতার প্রতি তাঁর অভিমানের কথা শুনিয়েছেন আবার পাশাপাশি রেখেছেন শ্রদ্ধার ভাব। প্রমাদারঞ্জন চরিত্রের নির্ভিক। জেদ আরও অনেক গুণের সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়েছেন। বলে গেছেন, প্রমদারঞ্জন রায়ের *'বনের খবর'*-এর মত বই-এর শ্রেষ্ঠত্বের কথা পিতাকে তিনি যে জীবনের একটা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, তার কথাও তিনি স্বীকার করেন। বিবাহের কারণে পিতার সঙ্গে লেখিকার সম্পর্কচ্যুতি তাঁকে গভীর বেদনা দিলেও জীবনে তিনি থেমে থাকতে চাননি লিখেছেন- *"যখন বুঝলাম যা হবার নয়, তা হবার নয়, তখন ঐ অধ্যায়টা খরচের খাতায় লিখে নতুন জীবন শুরু করলাম।''* [৮২]

পিতার অমতে বিবাহ করতে হয়েছিল কিন্তু সেই বিবাহের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে কেবল পারিবারিক বিরোধগুলিকে স্মরণ করেন নি। স্মরণ করেছেন সেই বিবাহের আনন্দ, কোলাহলের স্মৃতিগুলিকেও। লেখিকার বিবাহের স্মৃতিগুলি

পড়তে পড়তে যখন পাওয়া যায়- এই বিবাহের অনুষ্ঠানে অনেকের জুতো চুরি হয়ে যাওয়ার মত মজার ঘটনা কিংবা বিবাহের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের আসা ও তার হাতে চামরার নক্সা করা ব্যাগ উপহার হিসাবে পাওয়ার মত ঘটনাকে স্মরণ করেছেন লেখিকা, তখনি বোঝা যায় লেখিকা জীবনের অবরোধগুলিকে পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াকেই জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এটাকে আমরা প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে একজন নারীর লড়াই হিসাবেও গ্রহণ করতে পারি। এখানে প্রচ্ছন্নে আরেকজন নারীর লড়াই-এর খবরও আমরা পেয়ে যাই তিনি হলেন লেখিকার মা সুরমা। পিতা মেয়েকে পরিত্যাগ করলেও মা হিসাবে সুরমা মেয়েকে পরিত্যাগ করতে পারেননি। বিবাহের ঘটনায় স্বামীর বিরুদ্ধাচারণ না করতে পারলেও বিবাহের পর নতুন বধূকে তিনি প্রয়োজন অনুসারে ঘরের ব্যবহারের বাসনপত্র দিয়ে যান। লেখিকার কথায়—

"বিয়ের দু-দিন পরে মা এসে ঘরদোর দেখে ভারি খুশি, কিন্তু রান্নাঘরে গিয়ে মুখ গম্ভীর হল। .... মা খাবার ঘরে বেরিয়ে এসে বললেন, 'রান্নাঘরটা সব সময় গিন্নির হাতে থাকা ভালো।' দু-দিন পরে সকালে আশুতোষ কলেজের মহিলা বিভাগ ছুটি হলে পর বাড়িতে এসে দেখি আমার খাবার ঘরের টেবিল বোঝাই চকচকে নতুন ক্রাউন অ্যালুমিনিয়মের বাসন নিয়ে, হাসি মুখে মা বসে আছেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'তোর দাদা দিদির কাছ থেকে টাকা নিয়ে কিনেছি।' সাধারণ সংসারে যা কিছু বাসন দরকার সবই ওর মধ্যে ছিল।'' [৮৩]

পিতার দ্বারা পরিত্যাক্ত মেয়েকে নতুন দাম্পত্য জীবনের প্রয়োজনের বাসনপত্র দিয়ে সুরমা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে এক প্রকার লড়াই করেছেন। সেদিন মা-য়ের এই ছোট্ট লড়াইও যে লেখিকাকে জীবন পথে এগিয়ে চলার প্রেরণা যুগিয়ে ছিল সহজেই অনুমান করা যায়। আত্মজীবনীকার লীলা মজুমদার সেকথা স্বীকারও করে নেন। লিখেছেন- *"এসব কিছু লেখিকা জীবনের কথা নয়, কিন্তু এসব দিয়েই লেখিকাদের মূলধন তৈরি হয়। টুকরো টুকরো অকিঞ্চিৎকর*

জিনিস, যার দামের হিসাব করা যায় না।'' [৮৪] সত্যিকার অর্থেই মানুষের জীবনপথের এগিয়ে চলার লড়াইয়ে অপর কারো দ্বারা ছোট্ট স্বীকৃতি ও গোটা জীবনের প্রেরণার হয়ে ওঠে মূলধন হয় জীবনে। সে স্বীকৃতি যে রূপেই হোক অকিঞ্চিৎকর জিনিস হলেও তার মূল্য আমরা নির্ধারণ করতে পারিনা। আত্মজীবনীকার লীলা মজুমদার তাঁর ব্যক্তি জীবনের এইরূপ ছোট ছোট ঘটনা অনুভূতির সংযোজন করাতে আমরা খুব কাছ থেকে বিশ শতকের এক নারীর হয়ে ওঠায় ধাপ বা পর্যায়গুলি অনুধাবন করতে পারি। নিঃসন্দেহে বলা যায় আত্মজীবনীর এই প্রসঙ্গগুলি বাংলা আত্মজীবনী সাহিত্য ধারার মানকে বৃদ্ধি করেছে।

বিবাহের পর লীলা মজুমদারকেও সাংসারিক দায়-দায়িত্বের ঘেরা টোপে পড়তে হয়েছিল। ব্যবহৃত হয়েছিল নিজের লেখালেখির কাজ এরজন্য তাকে আক্ষেপ করতে দেখা যায়। তবে এই কারণে তিনি স্বামী বা পারিবারিক বিশেষ কোন সদস্যকে দায়ী করেন নি। সামগ্রিকভাবে সর্বকালের মেয়েদের জীবনেই যে সাংসারিক দায়-দায়িত্বের মাঝে নিজেকে প্রকাশ করা একটা সমস্যা তার কথাই বলেন। লীলা মজুমদারের কথায়–

"আরেকটা কারণও ছিল। বেশি লেখা হয়ে উঠত না। আমার মতো মেয়েরা নানা রকম সাংসারিক দায়িত্বে জড়িয়ে পড়ে। সেগুলোর অযত্ন করলে বিবেকও দংশন করে, আবার বাড়ির কেউ-ও খুশি হয় না। খানিকটা দায়মুক্ত না হলে মেয়েদের পক্ষে কোনো সৃজনশীল কাজ করার পথে অনেক বাধা , বহু সম্ভাব্য প্রতিভাবো নষ্ট হয়ে যেতে পদখেছি। সব চাইতে দুঃখের কথা হল যারা– মেয়েদের মধ্যে এত কম প্রতিভা দেখা যায়, কেন ?– ইত্যাদি বলে আত্মতৃপ্ত আক্ষেপ করেন– তাঁদের সংসারের গিন্নিরাই যদি রান্নাঘরের যথেষ্ট তদারকি না করে ছবি আঁকতে, কি কবিতা লিখতে বসে তাহলে উক্ত মন্তব্যকারীরাই সবচেয়ে বেশি চটেন। এ সব মেয়লী দুঃখের কথা কাকে জানাই। তার ওপর আবার রান্নাঘরকে এবং

ছেলেমেয়েদের আদর যত্নকে আমি সর্বদা গুরুত্ব দিই। আমার স্বামীর মন উদার এবং যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হলেও ঘরের অযত্ন করে নিজের লেখার যত্ন কোনোদিনই করতে পারিনি। বিবেক দেয়নি।

এই জন্যেই সাধারণত মেয়েদের প্রতিভার পূর্ণ স্ফূরণ হয় একটু দেরিতে। ছেলে মেয়ে অপেক্ষাকৃত বড় হলে পর। সেই সঙ্গে স্বামীর অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হলে তো কথাই নেই। আজ কালকার সাহসী মেয়েরা সংসারের অকুলানো মেটাচ্ছে নিজেরা চাকরি করে। সেই একই মন্তব্যও শুনতে হচ্ছে। সংসারের খানিকটা সুবিধা হলেও, ছেলে মেয়ের অযত্ন হচ্ছে। হচ্ছে বৈ কি। এবং যতদিন না সংসার ব্যবস্থা বদলাবে, তাই হবেও। তবু বলি, নিন্দার ভাগী হয়ে বাণীদেবীর সাধনা করছে এমন মেয়ে এখানো বিরল। সংসারটা বাস্তবিক একটু ইয়ে।''[৮৫]

– সাংসারিক দায়-দায়িত্বের মাঝে নিজের লেখিকা সত্ত্বা বিকাশের দ্বান্দিকতার কথা বলতে গিয়ে লীলা মজুমদার সামগ্রিকভাবে নারী জাতীর সমস্যা হিসাবেই মনে করেছেন। আমাদের চিরাচরিত সমাজ কাঠামোই যে নারীকে তাঁর ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে সেই দিকটিকেই তিনি তুলে ধরেছেন। একজন নারী হিসাবে লীলা ও সাংসারিক দায়দায়িত্বকে অস্বিকার করতে পারেন নি রান্নাঘর সামলানো সন্তানদের পালনের মত দায়িত্বকে অস্বিকার করা তাঁর বিবেদংশনই মনে হয়েছে। স্বামী সহানুভূতিশীল হওয়ার পরেও তিনি পারেন নি সাংসারিক দায়িত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে। আসলে স্বামী সহানুভূতিশীল হওয়ার পরেও যে চিরাচরিত সমাজ কাঠামোকে অস্বিকার করা যে একজন নারীর পক্ষে কঠিন লীলা মজুমদার তার কথাই বলেন। তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর বাক্য– *"তবু বলি, নিন্দার ভাগী হয়ে বাণীদেবীর সাধনা করছে এমন মেয়ে এখনো বিরল। সংসারটা বাস্তবিক একটু ইয়ে।''*

সাংসারিক দায়-দায়িত্বের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেও নিজের লেখিকা হয়ে ওঠার স্বপ্নকে লীলা জিয়ে রাখেন। এরিমধ্যে কোন একসময় সাহিত্যিক

বুদ্ধদেব বসুর প্ররোচনায় *'বৈশাখি'* পত্রিকায় লীলার প্রথম বড়দের জন্য গল্প লেখা। সে সময় বৈশাখি পত্রিকায় *'সোনালি রূপোলি'* গল্পটি লিখেছিলেন। নিজের সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পেছনে বুদ্ধদেব বসুর সহযোগিতাকে তিনি মান্যতা দেন। লিখেছেন– *"আমি সর্বদাই বলি আমার লেখক হয়ে ওঠার মূলে আমার বন্ধু বুদ্ধদেবের হাতও আছে।"* [৮৬] কেবল নিজের ক্ষেত্রই নয়, বুদ্ধদেবের প্রচেষ্টায় সেসময় যে অনেক তরুণ লেখক সাহিত্যচর্চায় উদ্যোগী হতে পেরে ছিলেন তার কথাও বলেন।

বুদ্ধদেব বসুর লেখালেখি প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেছেন এক জায়গায় বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন– *"ওর উপন্যাস নিয়ে নানা লোকে নানা সমালোচনা করতেন। কেউ কেউ অসামাজিক বিষয়ের গন্ধ পেতেন। শুনেছি বেচারির যখন একটা ভালো চাকরির নিতান্ত দরকার ছিল, তখন নাকি সবচেয়ে উপযুক্ত প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও সেই অধ্যাপনার কাজটি ওকে দেওয়া হয়নি। এসব কথা ভাবলেও এখন হাসি পায়। তাহলে তো ইংরেজি সাহিত্যের তিন চতুর্থাংশ এবং শেক্সপীয়রের দশ ভাগের সাত ভাগ বাতিল করতে।"* [৮৭]

বিশ্ব সাহিত্যের আঙ্গিনাতেই লেখিকা বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য সৃষ্টির বিচার করেছেন। এক্ষেত্রে লেখিকার উচ্চশিক্ষাই তাঁকে যে সাহায্য করেছে বলা যায়। জ্ঞানের পরিধিতেই লেখিকা যেন যুগধারাকে অতিক্রম করে যান। বিশ শতকের বাঙালি নারীর জীবনের পরিসর বৃদ্ধিতে তাঁর শিক্ষা যে বিশেষ ভূমিকা নেয় দেখতে পাওয়া যায়।

সাহিত্যিক হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা পাবার আকাঙ্খাটি লীলা মজুমদারের ব্যক্তিজীবনে প্রবল ছিল। জীবনের মধ্যবর্তী পর্বে যখন তিনি সাংসারিক দায়-দায়িত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ সমবয়সী পুরুষ সাহিত্যিকদের আত্মপ্রতিষ্ঠা তাঁকে বিচলিত করেছিল। লিখেছেন, – *"আমার তখন তিরিশ বছর বয়স। সমবয়সীদের মধ্যে বুদ্ধদেব, অজিত দত্ত, চার বছরের বড় প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার- সকলেই*

বেশ নাম করে ফেলেছেন। কিন্তু আমি তখনো তৈরিই হইনি।'' [৮৮] ১৯৪০ সালে 'রামধনু প্রকাশ মন্দির' থেকে লেখিকার প্রথম গল্প গ্রন্থ 'বদ্যিনাথের বড়ি' প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময় তিনি অখ্যাত ছিলেন শিশু সাহিত্যিক রবীন্দ্রলাল রায় বই প্রকাশের জন্য 'রামধনু' পত্রিকার সম্পাদক ক্ষিতিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যকে লেখিকার কাছে নিয়ে এসেছিলেন। লেখিকা তাঁর প্রথম বই প্রকাশের উদ্যোগের স্মৃতিচারণ করে লেখেন, – *"রবীন্দ্রলাল ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য নামে একজনকে ধরে নিয়ে এল। হাসি-খুশি, মাথায় খুব লম্বা নয়, কোথাও অধ্যাপনা করে; বয়সে আমার চেয়ে এক বছরের ছোট, বিজ্ঞান নিয়ে অনেক পড়াশুনো করেছে; তার চেয়েও বড় কথা 'রামধনু' পত্রিকার সম্পাদক এবং সবচেয়ে বড় কথা ওদের একটি প্রকাশনালয় আছে, যেখান থেকে আমার একটি ছোটদের গল্পসংগ্রহ প্রকাশ করা যেতে পারে। মনে আছে, এ কথা শুনেই আমি গলে জল।''* [৮৯] প্রথম বই প্রকাশের সম্ভাবনায় লেখিকা যেভাবে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করেছেন তাতে যেন তাঁর আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করেছেন তাতে যেন তাঁর নারী পরিচয়টি দায়ী। সাংসারিক দায়-দায়িত্বের ঘেরাটোপে বই প্রকাশের মধ্য দিয়ে বহিঃবিশ্বে আত্মপ্রকাশের সুযোগ লেখিকার কাছে জীবনের কোন বিশেষ মুহূর্ত হিসাবেই ধরা পড়েছে। লেখিকার বই প্রকাশের সম্ভাবনায় আনন্দের বহিঃপ্রকাশে কিন্তু সমাজে নারীর অবরুদ্ধ জীবনকেই নির্দেশ করে।

প্রথম বই 'বদ্যিনাথের বড়ি' প্রকাশের সময় প্রকাশক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য বইয়ের অধীক বিক্রর জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে বইটির ভূমিকা লিখিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। লেখিকা জানিয়েছেন,– *"আমাকে বলত রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে একটি ভূমিকা লিখেয়ে আনলে বোধ হয় বই বাজারে বিকোবে। গল্পের জন্যে বিকোবেনা, ভূমিকার জন্য বিকোবে, কথাটা আমার পছন্দ হয়নি তবুও একবার বন্ধ অনিল চন্দের কাছে কথাটা পাড়লাম। সে তখন কবির সেক্রেটারি পদে ছিল।''* [৯০] প্রকাশকের কথা ঠিকঠাক মেনে নিতে না পেরেও রবীন্দ্রনাথের

কাছে লেখিকার বইয়ের *‘ভূমিক’* লেখার প্রস্তাব করা– মানসিক দ্বন্দ্বের এইরূপ বহিঃপ্রকাশ আত্মজীবনীর মাধুর্যতা বৃদ্ধি করেছে। সে সময় রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতার কারণে রবীন্দ্রনাথের হাতে বইয়ের ‘ভূমিকা’ লেখা সম্ভব হয়নি। লেখিকার প্রথম বই বাণিজ্যিকভাবেও ততটা সাফল্যের মুখ দেখেনি, নিজের প্রতিক্রিয়া জানাতে লিখেছেন– *“ভূমিকা টুমিকা লেখা হয়নি, বইও বিক্রি হয়নি লোকেও ভুলেও যেতে শুরু করেছিল। খালি আমি নিজে হতাশ হইনি।”* [৯১] প্রথম বইয়ের বাণিজ্যিক অসাফল্যের পরেও লেখিকার হতাশ না হওয়া তাঁর বিশেষ ব্যক্তিত্বশীলতারই পরিচায়ক। লেখিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবার লড়াকু মনোভাবকেও প্রকাশ করে।

এদিকে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় ১৯৩৯ সালে। লেখিকা জানান,– *“কাগজে দেখতাম ইউরিপের দেশগুলো ঝগড়া ঝাঁটি করতে করতে ক্রমে দুটো দলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে আমাদের কি? আমরা যে পরাধীন সেই পরাধীন। আবার একদিন কাগজে একটা ছোট্ট খবর দেখলাম যে কাদের একটা জঙ্গি জাহাজ ব্যাংককের দিকে এগুচ্ছে। মনে হয় জাপানী জাহাজ। জাপানীরা শত্রুপক্ষের বন্ধু। তখনো ব্রিটিশদের বন্ধুদের ভারতের বন্ধু, আর শত্রুদের ভারতের শত্রু বলে মনে করার নিয়ম ছিল। তবে দেশে সে অন্যরকম মতের লোকও আছে তাও জানতাম।”* [৯২] যুদ্ধটা কিন্তু বেশী দিন দূরে থাকলনা। *“কয়েক হাজার লোক অস্থায়ী চাকরি আর উর্দিপেল”* [৯৩] সুভাষ বসু বাড়ি থেকে অদৃশ্য হলেন। ভারতীয় নেতারা ব্রিটিশদের সঙ্গে সমঝোতা করেছেন। দেশের পূর্বপ্রান্তে যুদ্ধের হাঙ্গামায় মানুষের স্থানান্তর। বিদেশি সৈনিকে ভরে উঠল কোলকাতা শহর। ইতিমধ্যে কলকাতা শহরেও বোমা পড়ার আশঙ্কা। লেখিকার কথায়– *“সব জায়গায় খালি যুদ্ধের সর্বনাশের গল্প। কলকাতা নাকি এবার বিধ্বস্ত হয়ে যাবে, আর উঠবেনা। জানতাম সব বাজে কথা, তবু বড়ই মুষড়ে পড়তাম।”* [৯৪] যুদ্ধের আশঙ্খায় কোলকাতার মানুষ স্থানান্তর শুরু করেছিল। লেখিকাও ছেলে মেয়ে নিয়ে প্রথমে

কৃষ্ণনগরে ও পরে দার্জিলিং-এ গিয়ে উঠলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন চালচিত্রগুলি ধরা পড়েছে আত্মকথায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপটি শেষ হতে না হতে দেশ আরেকটি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল নির্মম দুর্ভিক্ষের শিকার হল বাংলা সহ গোটা দেশ। আত্মকথায় লেখিকা উল্লেখ করেছেন সেই দুর্যোগের দিনের কথা। লেখিকার কথায়– *"স্বাধীনতার ঠিক আগেই বাংলায় যে নির্মম দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তার বেদনার সঙ্গে হয়তো শুধু বঙ্কিম বর্ণিত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের তুলনা করা যায়। এ কষ্ট সাধারণ লোকের সবচেয়ে বেশি লেগেছিল।*

শুনেছিলাম কোনো ধরা বা বন্যা বা মহামারী দুর্ভিক্ষ এ নয়। একেবারে মানুষ ঘটিত ব্যাপার। বিদায় নেবার মুখে ব্রিটিশরা তাদের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থাপনা তুলে নেওয়াই ছিল এর প্রধান কারণ। কারণ যাই হোক, লক্ষ লক্ষ গ্রামের মানুষ না খেতে পেরে মরে গেল। যারা মরল না তারাও অমানুষ হয়ে গেল। শহরের ব্যববস্থাপনা বেশি ভালো, এই সরল বিশ্বাসে লক্ষ লক্ষ গ্রামের লোক কোলকাতায় এসে খাবারের দোকানের সামনে মরে রইল। লুটপাট করে খাবার মনুষ্যত্বটুকুও ততদিনে তাদের শেষ হয়ে গেছিল।''[৯৫] এই দুর্যোগের দিনে লেখিকা কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র ব্যবস্থাপনায় ত্রাণকার্যে উৎসাহিত হয়ে লেখিকাও তাদের সঙ্গে যুক্ত হন। লেখিকার চোখে সেদিনের ত্রাণকার্যে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র কর্মপ্রচেষ্টার ছবিও আমরা পাই– *"একদিনও ওরা রাজনীতির কথা বলেনি, বা দলে টানার চেষ্টা করেনি। আমি চিরকাল সব রাজনীতির দল এড়িয়ে চলেছি, এখনো তাই। কিন্তু ঐ মেয়েদের দেখে আমি বুঝলাম নারীত্বের কি অসীম শক্তি। কোনো ন্যাকামি, বাড়াবাড়ি নেই, কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য নেই। এই কাজগুলো করা দরকার, তাই করতে হবে। আর কি অপূর্ব কর্মক্ষমতা। মেয়েগুলো আমার আজীবনের বন্ধু হয়ে গেল।''* [৯৬] চল্লিশের দশকে ত্রাণকার্যের মত সমাজ সেবায় বাঙালি মেয়েদের সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আসা সমাজে নারীর ক্ষমতায়ণকে চিহ্নিত করেছে। সমাজে

পুরুষের সঙ্গে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে বাঙালি মেয়েরা যে অনেকটাই পরিপক্ক হয়ে উঠেছে আভাসিত হয়। আর দেখতে পাওয়া যায় লেখিকাও সেই আয়োজনে সামিল হয়েছেন।

এই সময় লেখিকার ব্যক্তিজীবনে আরেকটি পরিবর্তন সূচি হয়। জানিয়েছেন– *"১৯৪৪ সালে আমাদের পারিবারিক জীবনের স্বচ্ছ স্রোত বিঘ্নিত হল! আমার মাতৃসমা ননদের একমাত্র মেয়ে বিধবা হয়ে তার তিনটি অনূয়া কন্যা নিয়ে আমাদের বাড়িতে এল ... যে যাই হক ১৯৪৪ সালের শীতকালে তারা সকলে এল। পাড়াঁগায়ে জন্ম, সেখানে মানুষ। কথায় বার্তায় সাজসজ্জায়, মতামতে পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষার আর কুসংস্কারের ছাপ। আবার তার সঙ্গে কেমন একটা স্বচ্ছ সরলতা, যা আমার মনে ধরে গেল।"*[৯৭] জীবনের একটা নতুন উদ্দেশ্য পেয়েছিলেন লেখিকা, বিধবা ভাগ্নীর মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করলেও চিন্তিত ছিলেন মুখ্য তিরিশের কাছাকাছি বয়সি ভাগ্নী সুরমার ভবিষ্যত নিয়ে ভাগ্নী সুরমাকে স্বনির্ভর করতে সচেষ্ট হলেন লেখিকা। লিখেছেন– *"যেদিন থেকে কাগজে পড়েছিলাম সোভিয়েট ইউনিয়েনে পাঁচ বছরে নিরক্ষরতা ঘুচে গেছিল, সেদিন তেকে এ বিষয়ে বেজায় কৌতূহল ছিল। সুরমা আমার সে কৌতূহল মেটান। বারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। গ্রামের স্কুলে যেটুকু লিখেছিল কোন কালে ভুলে গেছে। ঠিক করলাম তাকে তৈরি করে নিজের পায়ে দাঁড় করাব। যাতে আর কোনো কালে সাহায্য চেয়ে তার ঐ অপূর্ব আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ না হয়।"*[৯৮] লেখিকার অল্প বয়সে বৈধব্যের শিকার আত্মীয়াকে স্বনির্ভর করে তুলে তাঁর আত্মসম্মান রক্ষার ভাবনা কিন্তু বিশ শতকের বাঙালি মেয়েদের ক্ষমতায়নের নতুন পাঠই রচনা করেছে লেকিকা। ভাগ্নী সুরমাকে 'বিদ্যাসাগর বাণীভবনে' ভর্তি করেন না সেখানে বৈধব্যের নিয়ম পালিত হয় বলে। ভর্তি করেন 'সরোজনলিনী'তে। লেখিকার কথায়– *"শুনলাম বিদ্যাসাগর বাণীভবনে বৈধব্যের সব নিয়ম পালন করতে হয়, যান পরা নিরামিষ খাওয়া, একাদনি ইত্যাদি। তাতে*

আমি খুশি নই। শেষ পর্যন্ত সরোজনলিনীতে ভর্তি করলাম। বাড়ি থেকে যাওয়া আসা করত। সাধারণ লেখা পড়া, দরজির কাজ, কারুকার্য, তাঁত, উল-বোনা, ক্রুশ বোনা, সব কিছুতে চার বছরে দক্ষ হয়ে উঠল সুরমা।''[৯৯] বৈধব্যের পালনীয় রীতিকে অস্বীকার করে লেখিকার ভাগ্নী সুরমার ভবিষৎ গড়ার ভাবনাতে সমাজের পিতৃতান্ত্রিকতাই পরস্ত হয়। ভাগ্নীর সুরমার সাফল্যে লেখিকা উৎসাহিত হয়েছিলেন। এর প্রভাব যে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে ও পড়েছিল নিজেই স্বীকার করেন, – "*আমার প্রায় সব বড়দের উপন্যাসেই অনাথা, গৃহহারা অথচ লড়াই-করা মেয়েদের নিয়ে কারবার। ভঙ্গুর দুঃখিনীদেরো শেষ পর্যন্ত পায়ে বল জুগিয়েছে। একটা গোটা অনাথ পরিবারকে বলিষ্ট সুন্দর হয়ে উঠতে দেখে এসব গল্প অংকুরিত হয়েছিল।*''[১০০] জীবনের হয়ে ওঠার পর্বটির ছোট ছোট সাক্ষর এভাবেই রেখে গেছেন। আত্মজীবনীকার লীলা মজুমদার।

জীবনের এই পর্বে একদিকে ঘর সমলানো, ছেলে মেয়েদের মানুষ করা তার পাশাপাশি নিজের লেখালেখির কাজ চালিয়ে যাওয়া সব কিছুই করেন লীলা মজুমদার। জীবনের ঘটমান পর্বটির কথা বলে গেছেন পাশাপাশি সমকালীন সময়েরও পরিচয় দেন। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হল। দেশের স্বাধীনতা পর্বটি লীলা মজুমদারের চোখে এভাবে ধরা পড়ে– "*দিল্লিতে ইংরেজ বড়লাট রইলেন। তিনি নাকি আমাদের স্বাধীন হবার পথ খোলতাই করে দেবেন। বেকুব বনে গেলাম। কে বন্ধু কে শত্রু গুলিয়ে গেল।*''[১০১] লীলা মজুমদার ছিলেন শিক্ষিত চেতনাশীল ব্যক্তিত্ব দেশের স্বাধীনতাকে তিনি আবেগের চোখে না দেখে অনেকটাই তলানি থেকে দেখতে পেরেছিলেন। স্বাধীনতার পূর্বে সম্প্রদায়িক দঙ্গা, দেশ ভাগ, উদ্বাস্তুদের আগমন এসব চিত্রগুলিও স্থান পেয়েছে তাঁর আত্মকথায়। আর এই ঘটনাবৃত্তিগুলিতে ব্যথিত যে হয়েছিলেন আত্মকথায় জানিয়েছেন।

জীবনের টুকরো এক একটি ঘটনা, তার মধ্য দিয়ে জীবনের বিকাশ ধারাটির

আনুপুঙ্খিক পরিচয় দিয়ে গেছেন লেখিকা। ১৯৪৭ সালে দেশের স্বাধীনতা পর্বটি উদ্‌যাপনের মাঝেই গিয়েছিলেন শৈশবের ফেলে আসা শিলং ভ্রমণে, আশাহত হন তিনি, যে প্রকৃতির কোলে বড় হয়েছিলেন সেসময় খুঁজে পাননি তাকে। নিজের অনুভূতির কথা জানাতে লিখেছেন– *"কালের জারদখলীদের আমার মন মানতে চায়না। দেখলাম যেখানে যেখানে মানুষের হাত পড়েনি সেখানেই আমার ছোটবেলাটি আঁকরে রয়েছে।"*[১০২] মানুষের হাতে প্রকৃতি আজ যেখানে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হয়ে চলছে লেখিকার জীবন অনুভূতির এই পাঠ যেন গভীর দোতনা বাহী হয়ে পড়েছে। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয় লেখিকার দ্বিতীয় বই দিনে-দুপুরে এই বইটি প্রকাশের পর তিনি যে সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন জানিয়েছেন। সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি দিয়েছেন প্রকাশ সিগনেট প্রেসের তৎকালীন কর্ণধার দীলিপ গুপ্তকে – *"১৯৪৮ সালে 'দিনে-দুপুরে' বেরোল। এবং দিলীপ গুপ্ত বলে একজন অবিস্মরণীয় মানুষের সঙ্গে আমার চেনাজানা হল। আর আমি ফিরে চাইনি। সাহিত্যের দুর্গম পাহাড়ের একটি ধাপে দিলীপ আমাকে পা রাখার জায়গা করে দিল।"*[১০৩] জীবনের হয়ে ওঠার পর্বটির কথা জানাতে এভাবেই আরও অনেক মানুষ স্বীকৃতি পেয়েছে লেখিকার আত্মকথায়। আত্মকথায় এইভাবে একাধিক মানুষের স্বীকৃতি পাওয়াও কিন্তু বিশ শতকের বাঙালি মেয়েদের বহুমাত্রিক জীবনকেই নির্দেশ করে। বাঙালি মেয়েরা যে বিশ শতকের পরিবর্তীত সমাজ ব্যবস্থায় ঘরের গণ্ডি পেরিয়ে নিজেদের মেলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল তারও প্রমাণ বটে।

লীলা মজুমদার সমসাময়িক পুরুষদের তুলনায় সাহিত্যিক হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে পেলেও তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা কিন্তু অল্প নয় শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা তিনি, সাহিত্যকার লীলা মজুমদার নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে যে বিশেষ পরিশ্রমি হয়েছিলেন, এটাই প্রমাণিত হয়।

১৯৫৬ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে লেখিকা আকাশবানীর কর্মী হিসাবেও

কাজ করেছেন। আকাশবানীর কর্মী হিসাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন মেয়েদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় শিক্ষার ওপর অনুষ্ঠান করতে। লেখিকার কথায়– *"কিছুদিন মহিলাদের ও ছোটদের বিভাগ পরিচালনাও করেছিলাম। সে সময় একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম। বেশি শিক্ষিত বা কম শিক্ষিত প্রায় সব মহিলাই ঘরকন্নার বুকে বাস করেন বটে, কিন্তু ঘরকন্নার ওপর হাড়ে চটা। মনে একটা বাসনা ছিল এইসব আলোকপ্রাপ্ত নারীদের দিয়ে যদি শিশুপালন, রান্নাবান্না, সেলাইবোনা, ঘর-সাজানোর কথা বলাই, তাহলে বিষয়গুলি বেশী কার্যকরী এবং চিত্তাকর্ষক হবে। কাজেই দেখলাম দু-চারজন অসাধারণ মেয়ে ছাড়া- (যেমন ড: রমা চৌধুরী, বা নলিনী দাস, বা কল্যাণী কার্লেকর, যাঁদের বিশেষ কৃতিত্ব সংসারের বাইরে!!)– অন্য শিক্ষিত মহিলারা দুটো প্রোগ্রাম করার পর অভিমান করে বলেন, 'কেন আমরা কি "বঙ্কিমচন্দ্রের নারী চরিত্র'' কিম্বা "রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নারীর ভূমিকা'', বা ঐরকম কোন বিষয়ে বলবার যোগ্য নাই? কিছুতেই তাঁদের বোঝাতে পারিনি বইয়ের চরিত্রের চেয়ে ঘরের গিন্নিদের ভূমিকার অনেক বেশী গুরুত্ব। তাদের কথা ভালো করে বলবার লোক পাওয়া যায় না। তা কে শোনে!''* [১০৪]

দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা মেনে লেখিকার মেয়েদের ঘরকন্নার শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়ার মধ্যে বিশেষ নারীবাদী ভাবনারই ঝলক পাই। নারীবাদী *'র‍্যাডিকাল'* পন্থীদের সঙ্গে মেলেনা। বিশিষ্ট পাশ্চাত্য নারীবাদীতাত্ত্বিক সিমনদা বোভোয়ার নারীকে পিতৃতন্ত্রের অবদমন প্রতিরোধ করতে পুরুষের সঙ্গ ত্যাগের কথা বলেন। নারীর প্রজনন ক্ষমতাকে পিতৃতন্ত্রের প্রভুত্বের কারণ হিসাবে গ্রহণ করে এর থেকে বেরবার পথ খুঁজেছেন এই ক্ষমতাকে বর্জনের মধ্যদিয়ে।[১০৫] কিন্তু এর মধ্যে প্রকৃত অর্থে বাস্তবতার অভাব দেখতে পাওয়া যায়। অসম্ভব ও বটে। লীলা মজুমদারের নারীবাদী চেতনা এই পথে হাটে না। তিনি জীবন বাস্তবতাকে গ্রহণ করে নারীর সাবলম্বী হওয়ার পথ খুঁজেছেন শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি অন্য সামাজিক দায়িত্বগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গ্রহণ করে। সমাজকে টিকিয়ে

রাখতে গেলে যে দায়িত্বশীল আধুনিক মনস্ক নারী-পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজন লেখিকা হয়তো সেভাবেই ভেবেছেন। পরবর্তী জীবনে গৃহস্থজীবনকে কেন্দ্র করে তাঁর বেশ কয়েকটি বই ও প্রকাশিত হয়- *'রান্নার বই'* (কমলা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে) (১৯৭৯), *'ঘরকন্নার বই'* (১৯৮৮), 'সংসারের খুঁটিনাটিও শিশুর নামকরণ' (১৯৯০) বইগুলি যেমন।

বেতারে কাজ করাকালীনই মহিলা মহলে *'ঠাকুমার চিঠি'* বলে ধারাবাহিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলেন। যেখানে ১১/১২ বছরের মেয়েকে তাঁর ঠাকুমা বিয়ে পর্যন্ত জীবনের যাবতীয় শিক্ষাদানের চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে *'মণিমালা'* (১৯৫৬) নামে তিনি তা প্রকাশ করেন। ঠাকুমার ভূমিকা এখানে agsny aunt অর্থাৎ মুশকিল আসান। মণিমালাকে আসলে সমাধানের আড়ালে নীতি কথার উপদেশই দিতে থাকেন ঠাকুমা। শুধু মা ও অন্যান্য বড়দের কঠোর নিয়মকে মসৃণ করে নব্য আদর্শে তিনি দীক্ষিত করতে থাকেন মণিমালাকে। তেরো/চৌদ্দ বছর বয়সী মণিমালাকে বোঝান ঠাকুমা যে রাস্তায় জোরে হাসা অনুচিত, পরিমার্জিত রুচির মহিলারা মিষ্টি করে নিঃশব্দে হাসেন। ঠাকুমার প্রেরণায় পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে পড়াশোনা সমাপ্ত করে মনিমালা। বি.এ. পাশ করে চাকরি করতে যায় সে। বাহিরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে করিয়ে দেন ঠাকুমা নারীত্বের নানা কলাকে অবহেলা যেন সে না করে। পরিপাটি করে চুল বাঁধা, সুন্দর রুচিসম্মত সাজ পোশাক করাও তার কর্তব্য। কিছুদিন পরে পরিবারের অমতে অন্যজাতের হিন্দু একজনকে বিয়ে করে মণিমালা। পরিবার ত্যাগ করলে বিয়ে দেন ঠাকুমা। *'নব্য নারী'* মণিমালাকে বারে বারে শরীর সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলেন ঠাকুমা। সুগৃহিনী হওয়ার হাজারে সুপরামর্শ দেন। সাধারণ মণিমালা ঠাকুমার উপদেশে আস্তে আস্তে *'নব্য নারী'*র সব গুণই গ্রহণ করতে শুরু করে। বিশ শতকের মাঝামাঝিতে *'নব্যনারী'* আর আদর্শ নয় ক্রমশ জীবনবাস্তবতাকে মেনে নারীর সাবলম্বী হয়ে ওঠা। নীতি কথনের উপন্যাস

মণিমালা-তে সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন লীলা মজুমদার।

বেতারের কর্মটি ছাড়াও ১৯৬১তে *'সন্দেশ'* পত্রিকার পুনরায় প্রকাশিত হতে শুরু করলে যুক্ত হল তার সঙ্গে। ১৯৬০ এর দশকেই *'চিল্ড্রেন্স বুক ট্রাস্টের'* সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন কর্মময় জীবনের অনেক পরিচয় দিয়েছেন লেখিকা তাঁর আত্মকথার পারিবারিক জীবনের স্মৃতিচারণাগুলি অবশ্য পাশাপাশি করেছেন ১৯৫৬তে দিয়ে ছিলেন কন্যার বিবাহ। ১৯৭৫ থেকে শান্তিনিকেতনবাসী হয়েছিলেন স্বামীর অসুস্থতার সূত্রে। *'পাকদণ্ডী'* বইটিতে তাঁর জীবনের ৭৫-৭৬ বৎসর কালের জীবন কথা লিপিবদ্ধ। জীবনের এই পর্বে এসে তিনি বারে বারেই উদ্যেমী হয়ে ওঠে নতুন কিছু করার জন্য। এর পরেও তিনি সুদীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন তখনও তিনি এই উদ্যেমী স্বভাবটিকে ছাড়েননি আমরা জানি। তাঁর এই আত্মকথার মধ্য দিয়ে বিশ শতকের এমন এক বাঙালি নারীর ছবি ফুটে উঠেছে যে আপন উদ্যেমে নিজের পৃথিবীর গড়ে তোলার স্বপ্নে মশগুল।

তথ্যসূত্র

১।	লীলা মজুমদার, পাকদণ্ডী, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ: ৩০।

২।	লীলা মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১।

৩।	ঐ, পৃ: ৫।

৪।	ঐ, পৃ: ২৬৮।

৫।	ঐ, পৃ: ৪।

৬।	ঐ, পৃ: ১৮।

৭।	ঐ, পৃ: ৬।

৮।	ঐ, পৃ: ৬।

৯।	ঐ, পৃ: ২৯।

১০।	ঐ, পৃ: ৩।

১১।	ঐ, পৃ: ৩৫।

১২।	ঐ, পৃ: ১৩-১৪।

১৩।	ঐ, পৃ: ২১।

১৪।	ঐ, পৃ: ২২।

১৫।	ঐ, পৃ: ৩৭।

১৬।	ঐ, পৃ: ৩৭।

১৭।	ঐ, পৃ: ৪২।

১৮।	ঐ, পৃ: ৪৪।

১৯।	ঐ, পৃ: ৪৪।

২০।	ঐ, পৃ: ৫১।

২১।	ঐ, পৃ: ৫১।

২২।	ঐ, পৃ: ৫২।

২৩। লীলা মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০।

২৪। ঐ, পৃ: ৫৩।

২৫। ঐ, পৃ: ৫৩।

২৬। ঐ, পৃ: ৫৩।

২৭। ঐ, পৃ: ৬০।

২৮। ঐ, পৃ: ৪১।

২৯। ঐ, পৃ: ৪৩।

৩০। ঐ, পৃ: ৫।

৩১। ঐ, পৃ: ১১।

৩২। ঐ, পৃ: ১৫।

৩৩। ঐ, পৃ: ৮০।

৩৪। ঐ, পৃ: ৮৪।

৩৫। ঐ, পৃ: ১৩৬-১৩৭।

৩৬। সরলাদেবী চৌধুরাণী, জীবনের ঝরাপাতা, দে'জ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ: ১৩৩।

৩৭। লীলা মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৪।

৩৮। ঐ, পৃ: ৮৭।

৩৯। ঐ, পৃ: ৮৯।

৪০। ঐ, পৃ: ৯৪।

৪১। ঈশিতা চক্রবর্তী ও অন্যান্য সম্পাদিত, নৈঃশব্দ ভেঙ্গে আত্মকথনে ভারতীয় নারী, স্ত্রী, কলকাতা, ২০০৫, পৃ: ৬৬।

৪২। প্রতিভা বসু, জীবনের জলছবি, আনন্দ, কলকাতা, পৌষ-১৪১৫, পৃ: ৮৬

৪৩। লীলা মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৩।

৪৪। লীলা মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৫।

৪৫। ঐ, পৃ: ১৪২-১৪৩।

৪৬। ঐ, পৃ: ১৩৪।

৪৭। ঐ, পৃ: ১২৫।

৪৮। ঐ, পৃ: ১০৮।

৪৯। ঐ, পৃ: ১২৭।

৫০। ঐ, পৃ: ১৭৩।

৫১। ঐ, পৃ: ১৪৪।

৫২। ঐ, পৃ: ১৪৪।

৫৩। ঐ, পৃ: ১৪৫।

৫৪। ঐ, পৃ: ১৪৫।

৫৫। মণিকুন্তলা সেন, সেদিনের কথা, 'মণিকুন্তলা সেন জনজাগরণে নারী জাগরণে' (জন্ম শতবার্ষিকী রচনা সংগ্রহ), থীমা, কলকাতা, ২০১০, পৃ: ৩১।

৫৬। লীলা মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৬।

৫৭। ঐ, পৃ: ১৬৫।

৫৮। ঐ, পৃ: ১৬৮।

৫৯। ঐ, পৃ: ১৭৬।

৬০। ঐ, পৃ: ২০৩।

৬১। ঐ, পৃ: ২২১।

৬২। ঐ, পৃ: ২২১।

৬৩। ঐ, পৃ: ২২৪।

৬৪। ঐ, পৃ: ২২৬।

৬৫। ঐ, পৃ: ২৩০।

৬৬। ঐ, পৃ: ২৩১।

৬৭। লীলা মজুমদাব, প্রগুক্ত, পৃ: ২২৭।

৬৮। ঐ, পৃ: ২২৯।

৬৯। ঐ, পৃ: ২২৯।

৭০। ঐ, পৃ: ২২৯।

৭১। ঐ, পৃ: ২৩১।

৭২। ঐ, পৃ: ২৪৩।

৭৩। ঐ, পৃ: ২৩৭।

৭৪। ঐ, পৃ: ২৩৯।

৭৫। ঐ, পৃ: ২৩৯।

৭৬। ঐ, পৃ: ২৪৭।

৭৭। ঐ, পৃ: ২৪০।

৭৮। ঐ, পৃ: ২৪১।

৭৯। ঐ, পৃ: ২৩৯-২৪০।

৮০। লীলা মজুমদার, আর কোনোখানে, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪১৯, পৃ: ১৯০।

৮১। লীলা মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৮।

৮২। ঐ, পৃ: ২৫৪।

৮৩। ঐ, পৃ: ২৫৯।

৮৪। ঐ, পৃ: ২৫৯।

৮৫। ঐ, পৃ: ২৯৫।

৮৬। ঐ, পৃ: ২৮২।

৮৭। ঐ, পৃ: ২৭৮।

৮৮। ঐ, পৃ: ২৭৯।

৮৯। ঐ, পৃ: ২৮৩।

৯০। লীলা মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮৪।

৯১। ঐ, পৃ: ২৮৪।

৯২। ঐ, পৃ: ৩০০।

৯৩। ঐ, পৃ: ৩০১।

৯৪। ঐ, পৃ: ৩০২।

৯৫। ঐ, পৃ: ৩০৭।

৯৬। ঐ, পৃ: ৩০৮।

৯৭। ঐ, পৃ: ৩১২।

৯৮। ঐ, পৃ: ৩১৪।

৯৯। ঐ, পৃ: ৩১৪।

১০০। ঐ, পৃ: ৩১৫।

১০১। ঐ, পৃ: ৩২০।

১০২। ঐ, পৃ: ৩২৬।

১০৩। ঐ, পৃ: ৩২০।

১০৪। ঐ, পৃ: ৩৫৪।

১০৫। সিমোন দ্য বোভোয়ার, দ্বিতীয় লিঙ্গ, কঙ্কর সিংহ অনুবাদক, র‍্যাডিকাল, কলকাতা, ২০১১, পৃ: ১৮৪।

প্রতিভা বসু

(১৯১৫-২০০৬)